পিচ্ছিল পথে অর্থনীতি

জীবন-জীবিকা রক্ষায় জন-প্রত্যাশা

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

পিচ্ছিল পথে অর্থনীতি

জীবন-জীবিকা রক্ষায় জন-প্রত্যাশা

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

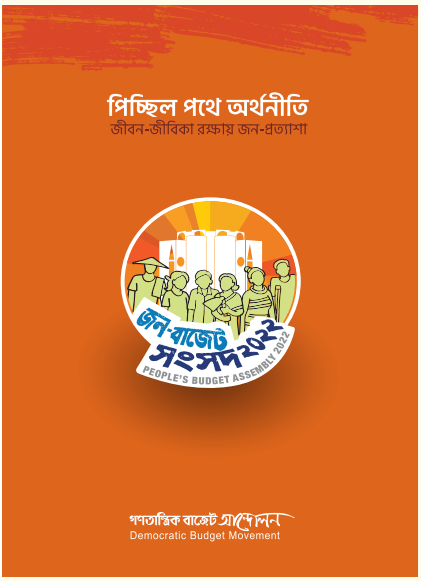

পিচ্ছিল পথে অর্থনীতি : জীবন-জীবিকা রক্ষায় জন-প্রত্যাশা

প্রকাশক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

প্রকাশকাল
ঢাকা, জুন ২০২২

সম্পাদনা
কাজী মারুফুল ইসলাম | আসগর আলী সাবরি | মনোয়ার মোস্তফা | এ আর আমান | মুসফিকুর রহমান | সেকেন্দার আলী মিনা | নুরুল আলম মাসুদ

প্রকাশনা সহযোগী
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

যোগাযোগ
৬/৫এ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
ইমেইল : democratic.budget@gmail.com

নিঃস্বত্ব
এই প্রকাশনাটি যে কোনো অবাণিজ্যিক কাজে যে কোনো মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। সূত্র উল্লেখ করার অনুরোধ রইলো।

মুখবন্ধ

২০২১ সাল আমাদের ইতিহাসের একটি বিশেষ মাইলফলক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। ভঙ্গুর অর্থনীতি আর নাজুক সামাজিক অবকাঠামো থেকে বর্তমান অবস্থায় উত্তরণ আজ দেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের প্রশংসনীয় অর্জন। সরকারের লক্ষ্য এখন ২০৩০ সালের মধ্যে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছানো ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিশ্চিত করা। তবে অগ্রগতির এই ধারা অনেকটা হোঁচট খেয়েছে কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কয়েক দফা আঘাতে, যার 'আফটার ইফেক্ট' এখনো রয়ে গেছে।

কোভিড ও লকডাউনের প্রভাবে ব্যাপক কর্মহীনতা ও আর্থিক ক্ষতি এবং মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি দেশের অসংখ্য মানুষকে নতুন করে দারিদ্র্য ঝুঁকিতে ফেলেছে। দারিদ্র্যের হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে- ২০.৫ শতাংশ থেকে ৩৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে। তবে কোভিড শুধু নিম্নবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত/ উচ্চ-মধ্যবিত্ত সহ সকলকেই কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেবল শহরেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও কোভিড দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। কর্মহীন শহর ফেরত নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠি ছাড়াও গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতিতে বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের চাপ নিতে হয়েছে।

অন্যদিকে কোভিড অতিমারির মারাত্মক প্রভাব যেতে না যেতে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা স্বরূপ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব চেপে বসেছে দেশের অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনের অস্থিরতার ফলে ভোজ্য তেল, গম, পশুখাদ্য, জ্বালানি তেলের দামের উর্ধ্বগতি নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। পাশাপাশি চলতি বছর মওসুমের আগেই অতিবৃষ্টি ও বন্যার মতো জলবায়ুজনিত দুর্যোগের বাৎসারিক অভিঘাত এদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে জীবিকার সংকট ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে ফেলেছে। এই ত্রিশংকু অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাৎক্ষণিক সহায়তার পাশাপাশি দরকার মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষা কৌশল।

জুন মাসে সরকার নতুন বছরের বাজেট ঘোষণা করবেন। সুতরাং এই বহুমুখী সংকট মোকাবেলায় দারিদ্র্যসীমার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীসহ নতুন করে দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা সম্ভাব্য জনগোষ্ঠীর জন্য অতিদ্রুত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না করলে বাংলাদেশের এ পর্যন্ত সকল অর্জন ম্লান হয়ে যাওয়ার আশু ঝুঁকি এড়ানোর সুযোগ নেই। এজন্য প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মতো প্রকল্প নির্ভর কেন্দ্রীয় উদ্যোগের পরিবর্তে দরকার বিকেন্দ্রীকৃত, গভীর ও সম্প্রসারণমুখী, অধিকারভিত্তিক একটি সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার ধারণা, কাঠামো ও প্রক্রিয়া।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি ব্যবস্থার দাবি তুলে আসছে। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে ইতিমধ্যে সরকারের একটি নীতিগত অবস্থানের আভাস পাওয়া গেছে। এখন দরকার একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, যার বহিঃপ্রকাশের একটি বড় মাধ্যম হলো জাতীয় বাজেট। আসছে 'জাতীয় বাজেট' নামক এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সামগ্রিক সূত্রপাত হবে বলে আমরা আশা করছি। একইসাথে আমরা মনে করি যে, গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন-এর বাজেট বিকেন্দ্রীকরণ ও জনঅংশগ্রহণের দাবি বাস্তবায়িত হলে অতিদ্রুত আমরা একটি জনকল্যানমুখী বাংলাদেশের স্বরূপ দেখতে পাবো।

সূচি

১.	জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ : প্রেক্ষিত ও কতিপয় বিবেচ্য	–	০১
২.	জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা প্রচলন ও অর্থায়ন : একটি ধারণাপত্র	–	০৪
৩.	সর্বজনীনতার প্রশ্নে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি	–	১৪
৪.	কৃষি বাজেটে চাই ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়ক নীতি সুরক্ষা	–	২১
৫.	বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাত: প্রেক্ষিত জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩	–	২৭
৬.	মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অধিক বরাদ্দ এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা	–	৩৩
৭.	পরিচ্ছন্নকর্মী, চা-শ্রমিকসহ দলিত জনগোষ্ঠীর বাজেট ভাবনা	–	৩৭
৮.	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রত্যাশা	–	৪১
৯.	তারুণ্য ও কর্মসংস্থান জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগাতে আমাদের প্রস্তুতি কতখানি?	–	৪৪

জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ প্রেক্ষিত ও কতিপয় বিবেচ্য

■ মনোয়ার মোস্তফা

বিশ্বব্যাপী বিরাজমান এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে এবারের জাতীয় বাজেট প্রণীত হচ্ছে। কোভিড মহামারির কারণে বিগত আড়াই বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। মহামারি শেষ হবার পর যখন দেশগুলোর অর্থনীতি ধীরে ধীরে চাঙ্গা হতে শুরু করেছে ঠিক তখনই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। একদিকে মহামারি পরবর্তী অর্থনতি চাঙ্গা হবার প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী পণ্য ও সেবার সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনি যুদ্ধের কারণে এবং আরো বিশেষ ভাবে পশ্চিমা দেশগুলো কর্তৃক রাশিয়ার ওপর নানা ধরণের অর্থনৈতিক ও আর্থিক অবরোধের ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ফলাফল হিসেবে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ও আন্তর্জাতিক বিনিময় মুদ্রা ডলারের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতির হার এখন ৮ দশমিক ৩ শতাংশ, ইউরোপের দেশগুলোর গড় মূল্যস্ফীতি ৭ দশমিক ৬ শতাংশ। রাশিয়ার মূল্যস্ফীতি আরো অনেক বেশি।

আমদানি ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবার ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। বিশেষ করে খাদ্যপণ্য ও জ্বালানী আমদানিতে বাড়তি ব্যয় করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে এই ধরণের পণ্যের আমদানি ব্যয় বেড়েছে গড়ে ৪০%। এর প্রভাব পড়েছে অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের ওপর। মূল্যস্ফীতির ধাক্কায় মানুষের প্রকৃত আয় কমে গেছে। বিশেষ করে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারগুলো জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে হিমশিম খাচ্ছে। সরকার চেষ্টা করছে আমদানি ব্যয়ের ওপর লাগাম টেনে ধরতে। বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ঠিক রাখার জন্য বিলাসবহুল পণ্য আমদানি, সরকারি কর্মচারীদের বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের তরফ থেকে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

এরকম এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে এবারের বাজেট প্রণীত হতে যাচ্ছে। জাতীয় অর্থনীতির চলার পথটা এখন দারুন পিচ্ছিল। সতর্কতার সাথে পা না চালালে যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে।

যুদ্ধের নেতিবাচক অভিঘাত

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর পশ্চিমা দেশগুলো

রাশিয়ার ওপর বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের প্রভাব বাংলাদেশেও অনুভূত হচ্ছে। যুদ্ধের প্রভাবে রাশিয়া ও ইউক্রেনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত "সুইফট" সিস্টেম থেকে রাশিয়াকে সরিয়ে দেবার কারণে আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যও ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছে। তৈরি পোষাক রপ্তানি খাত সংকটের মধ্যে পড়েছে। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী জ্বালানী তেল ও এলএনজি'র দাম বেড়ে গেছে। বাংলাদেশকে বর্ধিত মূল্যে এগুলো কিনতে হচ্ছে। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) হিসাব অনুযায়ী, বাড়তি দামের কারণে প্রতিদিন প্রায় ১৯ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। তেলের উচ্চ মূল্যের সাথে, গ্যাস, সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধির মাধ্যমে "চেইন প্রভাব" অনুভূত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, গত বছর (২০২১) নভেম্বর মাসে ডিজেলের দাম প্রায় ২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছিল। এই দাম বৃদ্ধির প্রভাব ইতোমধ্যে উচ্চ পরিবহন খরচ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দামের মাধ্যমে বাজারে প্রতিফলিত হয়েছে। রাশিয়া বাংলাদেশে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রায় ১২.৫ বিলিয়ন ডলারের রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র (আরএনপিপি) যার মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই সর্বোচ্চ ব্যয়ের উন্নয়ন প্রকল্প। রাশিয়ার ওপর আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলির অবরোধের কারণে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে, বেড়ে যাচ্ছে প্রকল্প ব্যয়। অন্যদিকে রাশিয়া, বেলারুশ ও ইউক্রেন থেকে আমরা সার আমদানি করি। যুদ্ধের কারণ এই সরবরাহ বাধাগ্রস্থ হয়েছে। ফলে কৃষি উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব, উৎপাদন হ্রাস ও যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী খাদ্যপণ্যের মূল্য বেড়েছে। বিশ্বব্যাপী ভোজ্য তেলের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়ীদের কারসাজি- যার ফলে সাধারণ মানুষ দারুনভাবে বিপদের মধ্যে পড়েছে। ভারত গম রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে আটাসহ নানা ধরণের বেকারি পণ্যের দাম ইতোমধ্যেই ২০ শতাংশের ওপর বেড়ে গেছে। খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি আমাদের সামগ্রিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নাজুক অবস্থার মধ্যে ছুড়ে দিয়েছে।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণই এক নম্বর কাজ

বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। তবে এর সাথে যুক্ত হয়েছে দেশের অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি ও অতিমুনাফার লোভ- যা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে নিয়ে গেছে। বিবিএসের হিসাবমতে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার ৬ দশমিক ২ শতাংশ, যা বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় কম। তবে বেসরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী দেশের মূল্যস্ফীতি আরো বেশি। বিশেষ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশ অতিক্রম করেছে বলে তাদের ধারণা। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাজার মনিটরিংয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সেক্টরে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাজেটে প্রণোদনা ও বরাদ্দ থাকতে হবে। শিল্পোৎপাদনের পাশাপাশি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সারের ওপর ভর্তুকি বৃদ্ধি করা, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে শুল্ক সুবিধা, কৃষকদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এবারের বাজেটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। করোনাকালে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত অনেকে কর্ম হারিয়েছেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ বাড়িয়ে তাদের কর্মের সংস্থান করা যেতে পারে।

রাজস্ব আয় বাড়াতে হবে

বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে দুর্বল দিক হলো- কর-জিডিপি'র অনুপাত। কোনোভাবেই ৯-১০ শতাংশের ওপরে ওঠানো যাচ্ছে না। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে এ হার সর্বনিম্ন। দেশের মাথাপিছু জিডিপি প্রতিনিয়ত বাড়ছে। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আয় ও সম্পদের বৈষম্য। আমাদের শ্রমশক্তির প্রায় ৮৭ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত। এ খাতে বিদ্যমান বেতন বা মজুরির পরিমাণও প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধির খুব একটা সহায়ক নয়। সেজন্য কর আহরণে

সরকারি প্রকল্প ব্যয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কোম্পানি করের ওপর নির্ভরশীলতা বেশি। কর সংগ্রহের নিম্নহারের জন্য প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি যেমন দায়ী, তেমনি উচ্চবিত্ত ও ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে অনীহা ও ফাঁকি দেয়ার প্রবণতাও সমানভাবে দায়ী। কর আহরণ ব্যবস্থায় দুর্নীতি চলছে বছরের পর বছর। সরকারি চাকুরে বা পেশাজীবীদের মধ্যে বেশি বেতনভোগী বিশেষ একটি শ্রেণী আইনের মারপ্যাঁচে কর প্রদানে বিরত থাকছে, আবার বেসরকারি খাতের অনেক চাকুরিজীবী এবং দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত বিদেশী নাগরিকদের কাছ থেকে যথাযথ কর আদায় করা যাচ্ছে না।

এ প্রেক্ষাপটে উচ্চবিত্তদের কাছ থেকে "প্রগ্রেসিভ হারে" অধিক কর আহরণে মনোযোগ দিতে হবে। বৈষম্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে এক শ্রেণীর মানুষের শুধু আয় নয়- সম্পদের পরিমাণও বাড়ছে। সম্পদের ওপর করারোপের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। বৈষম্য রোধের অন্যতম কার্যকরী পন্থা হলো আয় ও সম্পদের ওপর করারোপ ও পিছিয়ে পড়া বা বৈষম্যের শিকার জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। এ জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো ও দুর্নীতি কমাতে তাদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি।

বাজেট ঘাটতি কমাতে অপ্রয়েজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প ছেঁটে ফেলতে হবে

বর্তমান নাজুক পরিস্থিতিতে বাজেট ঘাটতি ৫ শতাংশের ভেতর রাখা বাঞ্ছনীয়। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে সরকারি ঋণগ্রহণ কমিয়ে আনতে হবে। এ পর্যন্ত যে ঋণ করা হয়েছে তার সুদ পরিশোধের পরিমাণ বছর বছর বেড়েই চলেছে। আগামী বছর কেবল সুদ পরিশোধেই ব্যয় হবে ৮০ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের তুলনায় প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা বেশি। ঋণগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের পর যদি এর রিটার্ন বা কস্ট-বেনিফিট অনুপাত ধনাত্মক না হয় তবে সে প্রকল্প সম্পদ না হয়ে দায় হিসেবে পরিগণিত হয়। শ্রীলংকার সাম্প্রতিক দুঃখজনক ঘটনাবলী থেকে আমাদের এই শিক্ষাটাই নিতে হবে। অতিরিক্ত ঋণগ্রহণ ও অলাভজনক প্রকল্পে ব্যয়, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে টান পড়াসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতার ফলে শ্রীলংকার অর্থনীতির যে বিপর্যয় হয়েছে, বাংলাদেশেরও সে অবস্থা হতে পারে বলে অনেকে সতর্ক করছে, যদিও আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি শ্রীলংকার চেয়ে অনেক মজবুত ও উন্নত। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প কেটে ছেটে বাদ দিতে হবে। এমনকি রাজস্ব বাজেটের অধীন অনেক ছোট ছোট প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। মোদ্দা কথা হলো- এবারের অপব্যয়-অপচয়ের হাত থেকে উন্নয়ন বাজেটকে রক্ষা করতে হবে।

নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আকার ও পরিধি বাড়াতে হবে

মূল্যস্ফীতির নেতিবাচক অভিঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা- এবারের বাজেটের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর জন্য মুদ্রানীতির যথাযথ প্রয়োগ ও বাজেটের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। এই শেষোক্ত কাজটির জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বা সেফটি নেট ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রতি বছরই সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেট বাড়ানো হয়। এবারের বাজেটেও হয়তো তার ব্যতিক্রম হবে না। তবে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি ভাতার হার বৃদ্ধি করে মূল্যস্ফীতি সমন্বয় করা দরকার। বিশেষভাবে জোর দিতে হবে- খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত কর্মসূচি ও প্রকল্পের দিকে। এগুলোতে বরাদ্দ বাড়ানোর পাশাপাশি বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করতে হবে।

জীবন ও জীবিকা রক্ষায় সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার প্রচলন ও অর্থায়ন: একটি ধারণাপত্র

■ এ. আর. আমান

২০২১ সাল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তি। ব্যাপক পরনির্ভরশীলতা, অবজ্ঞা, দুর্যোগের চরম ঝুঁকি ও হতদরিদ্র অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থায় উত্তরণ এদেশের মানুষ ও রাষ্ট্রের প্রশংসনীয় অর্জন। সরকারের লক্ষ্য এখন ২০৩০ সালের মধ্যে নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ থেকে উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশে পৌঁছানো ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য নিশ্চিত করা।

তবে অগ্রগতির এই ধারা অনেকটা হোঁচট খেয়েছে কোভিড-১৯ জনিত অতিমারির কয়েক দফা আঘাতে, যার "আফটার ইফেক্ট" এখনো রয়ে গেছে। কোভিড ও লকডাউনের প্রভাবে ব্যাপক কর্মহীনতা, আর্থিক ক্ষতি এবং মৃত্যু ও স্বাস্থ্যঝুঁকি দেশের অসংখ্য মানুষকে নতুন করে দারিদ্র্য ঝুঁকিতে ফেলেছে। দারিদ্র্য হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ২০.৫ শতাংশ থেকে ৩৬.৫ শতাংশে পৌঁছেছে বলে বিভিন্ন বেসরকারি গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে[১] । তবে কোভিড-১৯ শুধু নিম্নবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত/ উচ্চ-মধ্যবিত্ত সহ সকলকেই কোনো না কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কেবল শহরেই নয়, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও কোভিডের ব্যাপক প্রভাব রয়ে গেছে। কর্মহীন শহর-ফেরত নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠি ছাড়াও গ্রামীণ কৃষি-অর্থনীতিতে বিদেশ ফেরত প্রবাসী শ্রমিকদের চাপ নিতে হয়েছে।

১. সানেম, সিপিডি, বিআইজিডি-পিপিআরসি, বিআইডিএস এর ২০২০-২২ সালের পৃথক প্রতিবেদনসমূহ

কোভিড অতিমারির মারাত্মক প্রভাব যেতে না যেতে গোঁদের উপর বিষফোঁড়ার মতো ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব চেপে বসেছে অর্থনীতিতে। আন্তর্জাতিক সরবরাহ চেইনের অস্থিরতার ফলে ভোজ্য তেল, গম, পশুখাদ্য, জ্বালানি তেলের দামের উর্ধ্বগতি নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষকে বিপাকে ফেলে দিয়েছে। অর্ধভুক্ত থেকে, বাজারে দেনা রেখে ও ঋণ করে সাধারণ মানুষকে জীবন চালাতে হচ্ছে। এ অবস্থা আরো কিছুদিন চললে কোভিড-১৯ সৃষ্ট দরিদ্র মানুষের সাথে আরো নতুন দরিদ্র যুক্ত হবে।

এর পাশাপাশি এ বছরে মওসুমের আগেই অতিবৃষ্টি ও বন্যার মতো জলবায়ুজনিত দুর্যোগের বাৎসরিক অভিঘাত এদেশের কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষকে জীবিকার সংকট ও আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে ফেলেছে। এই ত্রিশংকু অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে তাৎক্ষণিক সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজন মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক সুরক্ষা কৌশল। জুন মাসে সরকার নতুন

বছরের বাজেট ঘোষণা করবে। সুতরাং এই বহুমুখি সংকট মোকাবেলায় দারিদ্র্য সীমার মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠি সহ নতুন করে দারিদ্র্য ঝুঁকিতে থাকা সম্ভাব্য জনগোষ্ঠির জন্য অতিদ্রুত রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না করলে বাংলাদেশের এ পর্যন্ত অর্জিত সকল অর্জন ম্লান হয়ে যাবার ঝুঁকি তৈরি হবে। এজন্য প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মতো প্রকল্পনির্ভর কেন্দ্রীয় উদ্যোগের পরিবর্তে দরকার বিকেন্দ্রীকৃত, গভীর ও সম্প্রসারণমুখী, অধিকারভিত্তিক একটি সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার ধারণা, কাঠামো ও প্রক্রিয়া। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই এ বিষয়ে একটি নীতিগত অবস্থান নিয়েছেন। এখন দরকার একটি সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। বলা বাহুল্য প্রকল্পভিত্তিক প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে অধিকারভিত্তিক একটি সর্বজনীন সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা না গেলে বর্তমান অবস্থার কোনো গুণগত পরিবর্তন হবে না।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সামাজিক সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগ

সরকার প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাইরে করোনার ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠির জন্য আপদকালীন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার কোভিড মোকাবেলায় ১০ হাজার কোটি টাকার পুন: বরাদ্দ ঘোষণা করেছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের চাঙ্গা করতে ব্যাংকিং চ্যানেলে ২৩ টি প্রণোদন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। ৩৫ লক্ষ নিম্ন আয়ের পরিবারকে ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে প্রথম দুই দফায় মোট ১ হাজার ৭৬০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকার ঘোষিত ১২০ টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ১০ লক্ষ ৭৬ হাজার ১৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, যা বাজেটর ১৭.৮৩% ও জিডিপির ৩.১১%। তবে এই কর্মসূচিতে পেনশন, অবকাঠামো প্রকল্প ইত্যাদি পৃথকভাবে হিসাব করলে সরাসরি নিম্নবিত্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ ঘোষিত বাজেটের অনেক কম[২]। হিসাব করলে দেখা যায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য সরাসরি ৯টি নগদ সহায়তা প্রকল্প ও খাদ্য নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহ বাবদ বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৯ হাজার ৬৩৭ কোটি ৩০ লাখ টাকা ও ১৫ হাজার ৫৯ কোটি ৭২ লাখ টাকা। উল্লেখ্য সরকার ও গবেষকদের হিসাব অনুযায়ী দুর্বল তথ্যভান্ডার, দুর্নীতি/স্বজনপ্রীতির কারণে একটি বড় সংখ্যক জনগোষ্ঠি সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আসতে পারেন না। তারপর যেটুকু হাতে পান তা প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম। এটি একটা দীর্ঘমেয়াদি দুষ্টুচক্র। এর থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন একটা সর্বজনীন ব্যবস্থা, যেখানে পদ্ধতিগতভাবে কেউ বাদ পড়বেন না। আর যারা অন্তর্ভুক্ত হবেন তারাও প্রয়োজন মাফিক পুরো সুবিধাটাই পাবেন। এজন্য দরকার একটা সর্বজনীন ও অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি ও নীতি কাঠামো। এটি শুধু দারিদ্র্য বিমোচনের জন্যই নয়, মানসম্মত জীবনধারণে জনগণের মানবাধিকার এবং টেকসই ও কল্যাণমুখী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও একান্ত প্রয়োজন। সরকার নিজেই স্বীকার করেছেন "যেহেতু অর্থনীতির পরিধি ও আকার বাড়ছে, জিডিপি ও কর্মসংস্থানে আধুনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ও সুসংগঠিত সেবাখাতের অংশ বাড়ছে, সেহেতু নাটকীয়ভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রয়োজন ও চাহিদা পরিবর্তিত হবে। মধ্যম আয়ের দেশের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বর্তমানের প্রচলিত গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও খাদ্য নিরাপত্তা কেন্দ্রিক কর্মকান্ডসমূহ থেকে ভিন্ন হবে। সামাজিক বীমা ও কর্মসংস্থান বিধিবিধান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের পরিধি বিস্তৃত করতে হবে। তৈরি-পোশাক খাতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ক আলোচনা হচ্ছে।"

বাংলাদেশে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির বিবর্তন

স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছিল সরকারি কর্মচারীদের জন্য পেনশন বা অবসরকালীন ভাতা। এর পরিপূরক হিসেবে কাজ করতো প্রভিডেন্ট ফান্ড, যা ছিল সরকারি ও আনুষ্ঠানিক কর্মচারীদের জন্য সঞ্চয়ের একটি বাহন[৩]। সামাজিক নিরাপত্তার ধারণাটি প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র দুর্যোগের

২. ডেমোক্রেটিক বাজেট মুভমেন্ট- ডিবিএম (২০২১), সামাজিক সুরক্ষায় অর্থায়ন শীর্ষক বাজেট উত্তর ওয়েবিনারে উত্থাপিত অপ্রকাশিত নিবন্ধ, ডিবিএম, ঢাকা।

৩. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন (২০১৫), জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র ২০১৫, পৃষ্ঠা XVII ।

ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য চিন্তা করা হয়। ১৯৭৪ সালের খাদ্য সংকট ও আশির দশকে সংঘটিত উপর্যুপরি বন্যা এবং এ ধরনের অন্যান্য সংকটের প্রভাব মোকাবেলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য বিদেশি সহায়তাপুষ্ট খাদ্য সহায়তা ও গণপূর্ত কর্মসূচির মতো নতুন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করে[৪]। আশির দশকের শেষ দিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি, নব্বই দশকের শেষ দিকে বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতার মতো কর্মসূচির প্রচলন করা হয়। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিদেশি খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে সরকারি অর্থায়নে খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ সহায়তার হার বৃদ্ধি পায়। কিছু এনজিও প্রকল্পেও এ ধরণের কর্মসূচির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা

- **টার্গেট গ্রুপ ভিত্তিক, জীবনচক্র নির্ভর নয় :** প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচি গুলো মূলত: বিভিন্ন ঝুঁকির বিপরীতে টার্গেট গ্রুপ নির্ভর প্রকল্পভিত্তিক উদ্যোগ। অর্থাৎ মানুষের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রয়োজন ও চাহিদাকে মাথায় রেখে এগুলো প্রণীত হয়নি। তাই ঝুঁকিগ্রস্ত মা ও শিশু, তরুণ বেকার, অতিমারি বা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, শহুরে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ভর কোনো সুরক্ষা উদ্যোগ অনুপস্থিত। সরকারি হিসাবে প্রচলিত কর্মসূচিগুলো মানুষের জীবনে সব ধরণের ঝুঁকি মোকাবেলায় তৈরি নয়। এগুলো প্রায় ৬৫ শতাংশ জীবনচক্র সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করার চেষ্টা করে। তবে এক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ব্যবধান রয়ে গেছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে ০-৪ বছর বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি খুবই কম। অধিকন্তু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্কদের খুব ক্ষুদ্র একটি অংশ নামমাত্র সুবিধা পেয়ে থাকে। বিদ্যালয়গামী শিশুদের অন্তর্ভুক্তি সর্বোচ্চ হলেও তারা যে টাকা পায় তা পরিমাণে খুবই কম[৫]।

- **সর্বজনীন নয়:** অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে উপরে বর্ণিত জনগোষ্ঠির কেউ অন্তর্ভুক্ত হলেও সেই জনগোষ্ঠির সকলেই এর আওতাভুক্ত হওয়ার সুযোগ নেই। অর্থাৎ প্রচলিত উদ্যোগগুলো, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির সবার জন্য উন্মুক্ত নয়, অর্থাৎ সর্বজনীন নয়। ২০১০ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপে দেখা যায় চরম দরিদ্রদের প্রায় ৫৭ শতাংশ ও দরিদ্রদের ৬৬ শতাংশ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতার বাইরে রয়েছে।[৬]

- **অপর্যাপ্ত সুবিধা:** সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি-সমূহের একটা বড় সমালোচনা হলো অধিকাংশ কর্মসূচির বাজেটই আকারে ছোট এবং সুবিধাভোগী প্রতি গড় সুবিধার পরিমাণও কম[৭]। "টাকার অংক কম হওয়া এমন একটি সমস্যা যা বাংলাদেশের প্রায় সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে দেখা যায়"।

- **প্রকৃত সুবিধাভোগির অনেকে বঞ্চিত:** গত কয়েক দশকে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা কাগজে কলমে বাড়লেও সুবিধাভোগী নির্বাচনে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি থাকায় প্রকৃত জনগোষ্ঠির বড় অংশ এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ, ২০১০ সালে মাত্র ২৪.৫ শতাংশ পরিবার খানা আয়-ব্যয় জরিপে তালিকাভুক্ত ৩০টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তত যে কোনো একটার সুবিধা তারা পেয়েছেন।[৮] সরকারি হিসাবে ২০১৫ থেকে ২০১৮ অর্থ বছরে সামাজিক নিরাপত্তায় গড়ে ৩২ থেকে ৩৪ শতাংশ সুবিধাভোগী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মজার হিসাব হলো এই সংখ্যা সরকারি দারিদ্র হারের (২০.৫%) থেকে অনেক বেশি।[৯]

- **নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠি ব্যাপকভাবে বঞ্চিত:** প্রচলিত কর্মসূচিগুলো গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠি

৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত
৬. প্রাগুক্ত
৭. প্রাগুক্ত
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩৯

চিত্র ১ : উপকারভোগীদের দারিদ্র্য পরিস্থিতি ২০১০

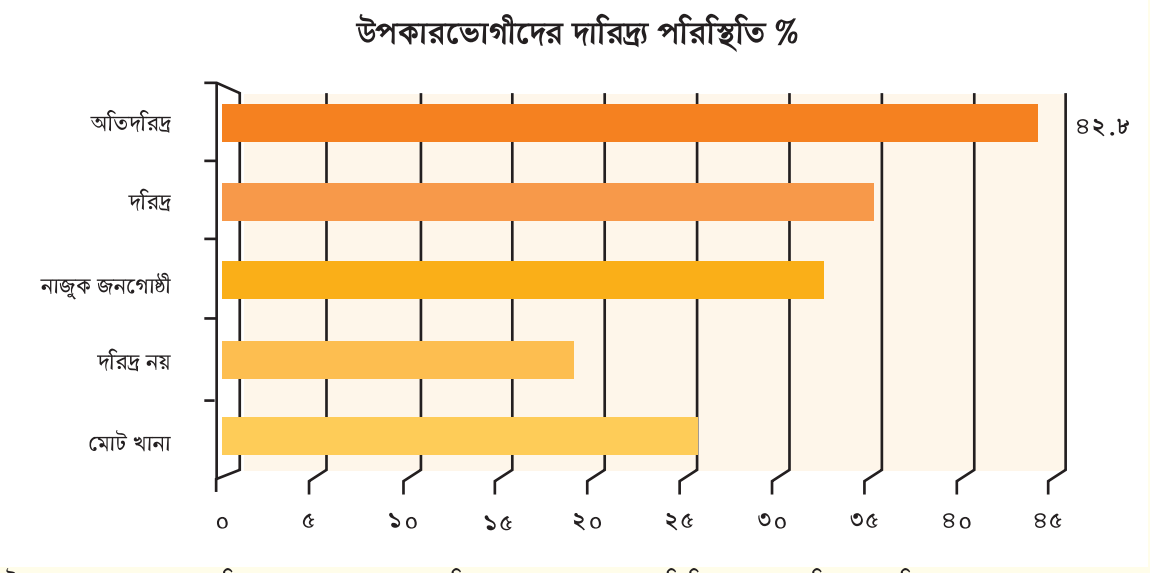

উৎস : খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওপর ভিত্তি করে সম্পাদিত অনুকৃতি

কেন্দ্রীক। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে গ্রামীণ দরিদ্র খানার অন্তর্ভুক্তি ৩০.১২ শতাংশ এবং নগর দরিদ্র খানার অন্তর্ভুক্তি ৯.৪২ শতাংশ। দেশের সকল বিভাগের বেলায়ও গ্রাম-শহরভিত্তিক এই পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

বর্তমান বাস্তবতায় জীবনচক্র নির্ভর সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা

মধ্য আয়ের বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার কমছে বলে যে আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান আমরা পাই সেখানে সামাজিক সুরক্ষা বলয় ও গভীরতা বাড়ানো ও সর্বজনীন করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কারো মনে সন্দেহ থাকলে সেটার মীমাংসা আগেই হওয়া জরুরি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাবে দেশে মাথাপিছু জিডিপি ২০২২ এর ৩য় প্রান্তিকে বেড়ে ২ হাজার ৮২৪ ডলার বা ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৪৭০ টাকায় পৌঁছেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯% বেশি। অন্যদিকে মূল্যস্ফীতিও সমান তালে বেড়ে চলেছে যা এপ্রিল ২০২২ এ বাংলাদেশে ব্যাংকের পয়েন্ট টু পয়েন্ট হিসাবে ৬.২৯%। এদিকে গড়পড়তা আয় বাড়লেও তার সুফল থেকে অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত। গিনি সহগের হিসাবে বৈষম্য ০.৪৫ থেকে বেড়ে ০.৪৮ এ পৌঁছেছে। ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়্যালিটি রিপোর্ট ২০২২ এর হিসাবে বাংলাদেশে শীর্ষ ১% মানুষ উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে, জাতীয় আয়ে যাদের হিস্যা ১৬.৩%। অন্যদিকে সবচেয়ে নীচে অবস্থানকারি দেশের অর্ধেক মানুষের জাতীয় আয়ে হিস্যা মাত্র ১৭.১% । সুতরাং উন্নয়নের সুফল থেকে বঞ্চিত মানুষের সুরক্ষায় প্রচলিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। প্রয়োজন সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার মতো আন্তর্জাতিকভাবে পরীক্ষিত ও স্বীকৃত পদ্ধতি।

সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্য হার ২০১৯ সালে ২০.৫ শতাংশে নেমে এলেও কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে নতুন করে মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে চলে এসেছে। বেসরকারি কয়েকটি পৃথক গবেষণা প্রতিবেদনের হিসাবে দারিদ্র্য হার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে ৩৬.৫ শতাংশ বা তারও বেশি সংখ্যায় পৌঁছেছে। এটা অনুমেয় যে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজ ও সীমিত পুঁজি হারিয়ে, শহরের বস্তি ও ঘর-বাড়ি ছেড়ে অনেক পরিবার গ্রামে ফিরে গিয়ে কোনো মতে জীবন রক্ষা করেছেন। প্রবাসী শ্রমিকরাও ব্যাপকভাবে এ দলে যোগ দিয়েছেন। যারা প্রবাসে

কোন রকমে টিকে ছিলেন প্রচারমাধ্যমের বিচ্ছিন্ন প্রতিবেদনে তাদের অসহায়ত্ব উঠে এসেছে। সরবরাহ চেইনের ভঙ্গুরতার কারণে কৃষক-খামারিরা খাদ্যপণ্য বিক্রি করতে ঝুঁকির মুখে পড়েছেন। শুধু স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠিই নয়, মধ্য ও উচ্চ-মধ্য আয়ের চাকুরিজীবী ও উদ্যোক্তা জীবিকা ও সম্পদ হারিয়েছে। একইসাথে স্বাস্থ্য বিষয়ক ঝুঁকির কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। হাজার হাজার পরিবার যেমন তাদের স্বজন হারিয়েছেন তেমনি আর্থিক সুরক্ষা ও দুর্বল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে জীবনের অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন প্রায় সবাই। সুতরাং একদিকে জীবনের ঝুঁকি ও অন্যদিকে জীবিকার অনিশ্চয়তা সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার মতো কল্যাণমুখি ও অধিকার ভিত্তিক কাঠামো নিয়ে ভাবতে একপ্রকার বাধ্য করেছে। দেশে বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তাদের তত্ত্বাবধান ও পরিচর্যা ব্যবস্থা ভেঙে পড়া (বিশেষত অতি দরিদ্রদের মাঝে), গ্রাম থেকে ক্রমবর্ধমান হারে শহরে অভিবাসন এবং ক্রমবর্ধমান নগরায়ন নতুন নতুন সংকটের সৃষ্টি করছে। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পাশাপাশি এগুলির সাথে অভিযোজনে সক্ষম হওয়ার কথা রাষ্ট্র নিজেও স্বীকার করেন। "কৃষি শ্রম বাজার সংকুচিত হয়ে আসায় প্রকৃত কৃষি মজুরির বেড়ে যাচ্ছে। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ এবং দারিদ্র্য ঝুঁকির রূপরেখা-ও পরিবর্তিত হচ্ছে। এজন্য একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা চাহিদা পূরণে বর্তমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের ধরণ বা পর্যাপ্ততার পুনর্মূল্যায়ন আবশ্যক।

একইসাথে আগের অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে বলা যায় প্রচলিত নিরাপত্তা বেষ্টনি অপর্যাপ্ত, ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং পুরনো কর্মসূচি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জীবনচক্র ভিত্তিক নতুন একটি কাঠামো নির্ধারণ দ্রুত প্রয়োজন। সরকারের নিজের উপলব্ধি - "কর্মসূচি-সমূহের সংখ্যাধিক্য (১৪৫টি), সহায়তার পরিমাণ ও উপকারভোগীর সংখ্যা বিবেচনায় কর্মসূচিসমূহের ছোট আকার এবং কর্মসূচি পরিচালনার সাথে জড়িত মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংখ্যা (২৩টি) এটাই নির্দেশ করে যে এ ধরনের বহুধাবিভক্ত ব্যবস্থা সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোনো কার্যকর উপায় নয়।"

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার ধারণা

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে সামাজিক সুরক্ষার দার্শনিক ধারণা নতুন নয় । আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, আন্তর্জাতিক শ্রম সনদে মানব সুরক্ষা ও শ্রমজীবীর সামাজিক নিরপত্তার কথা বলা হয়েছে। তবে বৈশ্বিক ডিসকোর্সে এটা নতুন করে আলোচনায় আসে ২০০৮-০৯ সালে। বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার ফলে সৃষ্ট মানবিক সংকট মোকাবেলা করতে ২০০৯ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-র উদ্যোগে জাতিসংঘের প্রধান নির্বাহী বোর্ড (UB CEB) নয়টি কৌশলগত অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, যার মধ্যে "ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা উদ্যোগ" (the Social Protection Floor Initiative) অন্যতম। কোভিড-১৯

চিত্র ২ : জীবনচক্রের ঝুঁকিসমূহ

১০. প্রাগুক্ত

অতিমারির মতো বৈশ্বিক দুর্যোগ পুরো বিশ্ববাসীকে এই বিষয়ে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

বিশ্বব্যাংকের সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রম-কৌশলে জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গঠনের একটি কার্যকর উপায় হিসেবে স্বীকৃত। জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি অধিকন্তু সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর পদ্ধতিকেও সমর্থন করে। সামাজিক নিরাপত্তা ফ্লোর জাতিসংঘ কর্তৃক চালু হয় এবং বাংলাদেশ সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ কর্তৃক তা গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সুপারিশ[১১] ও জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার সহমত অনুযায়ী বাংলাদেশে ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে ৪টি বিষয়ে রাষ্ট্রের গ্যারান্টি দরকার হবে।

ক) সর্বজনীন স্বাস্থ্য বা সবার জন্য স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা (মাতৃত্বকালীন সেবাসহ)। এজন্য সামাজিক স্বাস্থ্য বীমার প্রচলন দরকার যেখানে ব্যক্তি, রাষ্ট্র ও নিয়োগকর্তার (চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে) সামর্থ্য ও রাষ্ট্র নির্ধারিত কাঠামো অনুযায়ী ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য জনিত যেকোন ঝুঁকি মোকাবেলায় তথা চিকিৎসা খরচ মিটাতে আপদকালীন তহবিল/ বীমা ব্যবস্থার কার্যকরী বাস্তবায়ন করা।

খ) শিশুদের কল্যাণে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা, যার মাধ্যমে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য, শিক্ষা, সেবাযত্ন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা ও পণ্য নিশ্চিত করা যায়।

গ) কর্মক্ষম বয়সসীমার মধ্যে রয়েছেন কিন্তু অসুস্থতা, বেকারত্ব, মাতৃত্বকাল, প্রতিবন্ধিতার মতো অবস্থায় থাকাকালীন জনগোষ্ঠিকে ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা প্রদান করা।

ঘ) বয়স্ক ব্যক্তিদের আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে জাতীয় পেনশন স্কিম প্রচলন করা ও বয়সসীমার উপরে থাকা সবাইকে এর আওতায় আনা।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার নীতি ও আইনগত ভিত্তি, মানবাধিকার ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য

মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সকল মানুষের যথাযথ স্তরে সামাজিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

জাতীয় বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কর্মসূচিতে অর্থায়নের ধারা

অর্থ বছর	সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীতে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	মোট বাজেট কোটি টাকায়)	বাজেটের শতকরা হার	জিডিপি	জিডিপি শতকরা হার
২০১২-১৩	২৩,০৯৭.৫২	১৮৯,৩২৬	১২.২০	১,০৩৭,৯৮৭	২.২৩
২০১৩-১৪	২৬,৬৫৪.০১	২১৬,২২২	১২.৩৩	১,১৮১,০০০	২.২৬
২০১৪-১৫	৩০,৬৩৬.০০	২৩৯,৬৬৮	১২.৭৮	১,৫১৩,৬০০	২.০২
২০১৫-১৬	৩৫,৯৭৫.০০	২৬৪,৫৬৫	১৩.৬০	১,৭২৯,৫৬৭	২.০৮
২০১৬-১৭	৪০,৮৫৭.০০	৩১৭,১৭৪	১২.৮৮	১,৯৫৬,০৫৬	২.০৯
২০১৭-১৮	৪৮,৫২৪.০০	৩৭১,৪৯৫	১৩.০৬	২,২৩৮,৫০০	২.১৭
২০১৮-১৯	৬৪,৪০৪.০০	৪৪২,৫৪১	১৪.৫৫	২,৫৩৬,১৭৭	২.৫৪
২০১৯-২০	৮১,৮৬৫.০০	৫০১,৫৭৭	১৬.৩২	২,৮০৫,৭০০	২.৯২
২০২০-২১	৯৫,৫৭৪.০০	৫৬৮,০০০	১৬.৮৩	৩,১৭১,৮০০	৩.০১
২০২১-২২	১০৭,৬১৪	৬০৩,৬৮১	১৭.৮৩	৩৪,৫৬,০৪০	৩.১১

সূত্র: *https://socialprotection.gov.bd/en/social-safety-nets-in-bangladesh-budget*

জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার ২২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে।" ঘোষণার ২৫ অনুচ্ছেদের একই ধরনের অঙ্গীকার বিবৃত হয়েছে। "খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সামাজিক পরিষেবা লাভের সুযোগ এবং সেই সাথে বেকারত্ব, পীড়া, প্রতিবন্ধিতা, বৈধব্য, বার্ধক্য অথবা অন্য কোনো অনিবার্য কারণবশত জীবিকার অভাব হলে নিরাপত্তার অধিকারসহ নিজের ও পরিবারের সুস্বাস্থ্য এবং কল্যাণের জন্য মানসম্মত ও পর্যাপ্ত জীবনযাত্রার অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক চাহিদা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব। বিশদভাবে বলতে গেলে, "বেকারত্ব, ব্যাধি, বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত কারণে অভাব-গ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্যলাভের অধিকার সব নাগরিকের রয়েছে।"

দারিদ্র্য দূরীকরণ বিষয়ে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১ এর টার্গেট ১.৩ এ বলা হয়েছে, সবার জন্য জাতীয়ভাবে উপযুক্ত একটা সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো ও পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা এবং ন্যূনতম মাপকাঠি নির্ণয় করা, এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ব্যাপক দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্থ জনগোষ্ঠিকে এর আওতায় আনা। এছাড়া, টার্গেট ৩.৮ এ সকল জনগোষ্ঠিকে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার আ্ওতায় আনার কথা বলা হয়েছে, যা ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষার অন্যতম স্তম্ভ। সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে অন্যান্য টেকসই লক্ষমাত্রাতেও বলা হয়েছে যেমন - লিঙ্গভিত্তিক সমতা (টার্গেট ৫.৪), শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (টার্গেট ৮.৫), অধিকতর সমতা অর্জন (টার্গেট ১০.৪) ইত্যাদি।

সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষায় অর্থায়ন

বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তায় সরাসরি অর্থায়ন ও প্রত্যক্ষ সুবিধা প্রাপ্তির কারণে সুবিধাভোগী দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কাছে এটি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই এ কারণেই এই কর্মসূচিতে রাজনৈতিক সমর্থনও বাড়ছে। দারিদ্র্য হ্রাসে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ইতিবাচক ফলাফলের কারণে জাতীয় বাজেটের উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাতে বরাদ্দ করা হবে।

কোভিড পরবর্তী ২০২১-২২ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনিতে অর্থায়ন বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে মোট বাজেট বরাদ্দ ১ লক্ষ ৭ হাজার ৬১৪ কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় বাজেটের ১৭.৮৩%, এবং জিডিপির ৩.১১%। তবে এর আওতার মধ্যে থাকা সরকারি পেনশন, অবকাঠামো প্রকল্প ইত্যাদি পৃথকভাবে হিসাব করলে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জন্য সরাসরি খাদ্য ও অর্থ বাবদ বরাদ্দ অনেক কম। এ বছর মোট প্রকল্প কমে ১২০ টিতে উপনীত হলেও সর্বমোট ৬৬ কোটি ১০ লাখ ৮০ হাজার মানবমাস সমপরিমান সুবিধা রাখা হয়েছে।

গত ১০ বছরে (২০১২-১৩ থেকে ২১-২২) সামাজিক নিরাপত্তায় (সামাজিক ক্ষমতায়নসহ) সরকার জিডি-পর প্রায় ২.২ শতাংশ ব্যয় করে আসছে।[১২] তবে সরকারি পেনশন স্কিমের মতো কর্মসূচি বাদ দিলে এর পরিমাণ অনেক কম। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ওইসিডি দেশগুলোর গড় রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ জিডিপির ২০% (২০১৯), যা ফ্রান্সে ৩১% (২০১৯), জার্মানীতে ২৫.৯% (২০১৯)। মূলত: জীবনচক্রভিত্তিক সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কারণে উচ্চ ও উচ্চ-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে অধিক পরিমাণে বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে অর্থায়নের পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং সরকারকে অর্থায়নের নতুন উৎস খুঁজতে হবে।

অর্থায়ন কৌশল

ইউনিসেফের নতুন প্রতিবেদন অনুযায়ী কোভিড-১৯ পরবর্তী সংকট মোকাবেলায় মধ্য আয়ের দেশগুলোকে

---

১১. https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/sp-floor/lang--en/index.htm

১১. ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃষ্ঠা ৬৩৯

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে।[১৩] অর্থায়ন প্রসঙ্গে সরকারের মূল্যায়ন হলো, "দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্তদের সীমিত অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করে যে অর্থ ব্যবহারে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটালেও মধ্যম আয়ের একটি দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির জন্য বর্তমান বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়।" সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন করতে সরকারের রাজস্ব সক্ষমতা একটা বড় আলোচনার বিষয়। এ জন্য সরকার ত্রিমুখী কৌশলের চিন্তা করতে পারে–

১. সম্পদশালী ব্যক্তি ও কোম্পানির ওপর কর–আহরণ বাড়ানো ও কর ফাঁকি রোধ করতে কার্যকরি ব্যবস্থা নেওয়া,
২. অর্থায়নের নতুন উৎস খোঁজা, যেমন প্রবাসী আয়ের টাকায় পেনশন ফান্ডের মতো ব্যবস্থা তৈরি করা, এবং
৩. বিদ্যমান বাজেটের মধ্যে কম অগ্রাধিকারমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ কমিয়ে সামাজিক সুরক্ষা খাতে ক্রমান্বয়ে বরাদ্দ বাড়ানো।

উল্লেখ্য জাতীয় কৌশলপত্রে অর্থায়নের সম্ভাব্য নতুন উৎস হিসেবে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর), যাকাত, অনাবাসি বাংলাদেশিদের (এনআরবি) কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে আন্তর্জাতিক জনকল্যাণ তহবিল সৃষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন উৎসের সম্ভাবনা যাচাইয়ের কথা সরকার চিন্তা করছে।

জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলে কর রাজস্বভিত্তিক অর্থায়নের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তিদের জন্য পেনশন ও সামাজিক বীমার মতো কর্মসূচিতে বেসরকারি নিয়োগকর্তা ও চাকুরিজীবীর কনট্রিবিউটরি অর্থ বা চাঁদার মাধ্যমে অর্থায়নের কথা বিবেচনা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ব্যাপক মতামত ও গ্রহণযোগ্য কাঠামো ছাড়া স্কিমগুলোর বাস্তবায়ন কঠিন হবে। পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদের বিশেষত: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা ছাড়া পেনশন বা সামাজিক স্বাস্থ্য বিমার মতো সুরক্ষা কর্মসূচি জনপ্রিয় করা যাবে না। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীলংকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য নামমাত্র কনট্রিবিউটরি প্রিমিয়ামের ব্যবস্থা থাকলেও এ বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ পেনশন সুবিধা পাচ্ছেন। মূলত: সামাজিক সুরক্ষা খাতের অর্থায়নকে তিন ভাগে ভাগ[১৪] করা যেতে পারে:

- **সামাজিক ভাতা/ সহায়তা (Social Assistance):** মূলত: দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির অসুস্থতা, কর্মহীনতা, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার প্রয়োজন, প্রতিবন্ধিতাজনিত সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এর অর্থায়ন কর–রাজস্বের মাধ্যমে করা হয়।

- **সামাজিক বীমা (Social Insurance):** সামাজিক বীমা হলো সুবিধাভোগীর অংশগ্রহণে/ চাঁদার টাকায় পরিচালিত স্কিম যেখানে বাজার ব্যবস্থা বা বেসরকারি খাতের মাধ্যমে উপরিলিখিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা করা হয়। অপারগ জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অনেকসময় ভর্তুকি বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

- **বেসরকারি নিয়োগকারি প্রদত্ত সুবিধা (Active labor market program):** মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি, আঘাতজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি এর আওতাভুক্ত। সাধারণ কর্মী ও নিয়োগকারি উভয়ের যৌথ অর্থায়নে পেনশন, সামাজিক স্বাস্থ্য বীমা ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়।

সামনে অগ্রসর হওয়ার উপায়

ক. সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নীতি ও আইনী কাঠামো নির্ধারণে জনমত তৈরি ও কাঠামো বাস্তবায়ন:

---

১৩. 'Shortfalls in Social Spending in Low- and Middle-Income Countries. COVID-19 and Shrinking Finance for Social Spending', https://www.unicef-irc.org/events/short-falls-in-social-spending-in-low-and-middle-income-countries.html#:~:text=It%20calculates%20that%20low%2Dand,of%20GDP%20on%20social%20protection

১৪. Asian Development Bank (ADB), Poverty Dimension on the Social Protection Index, ADB Brief NO 22, May 2014, accessed at https://www.adb.org/sites/default/files/publication/42479/poverty-dimension-social-protection-index.pdf accessed on May 20, 2022

সরকারের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের লক্ষ্য অনুযায়ী সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়নে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে থেকে উদ্যোগ নেয়া। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগকে যুক্ত করে তৃণমূল পর্যায়ে জনঅভিমত সংগ্রহ করা। একইসাথে উদ্যোগ টেকসই করতে সকল রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় করা। পাশাপাশি সাধারণ পেশাজীবী, অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী, বীমা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকর্তাদের সংগঠন, কৃষক ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সাথে পরামর্শ করা দরকার। জলবায়ুজনিত দুর্যোগ, কোভিড-১৯ অতিমারি ও ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জীবন ও জীবিকা রক্ষায় আসন্ন ২০২২-২৩ জাতীয় বাজেট অধিবেশনে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও আলোচনা হওয়া দরকার। বলা বাহুল্য , ঠিক এই মুহূর্ত থেকে আলোচনা শুরু করলেও তার কার্যকরি বাস্তবায়ন, অর্থায়ন ও সম্প্রসারণে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে অসংখ্য প্রাণ ও জীবনমান রক্ষায় আশু ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে আমরা নি:সন্দেহে পৌঁছাবো কিন্তু তার ফল সবাই ভোগ করতে পারবে না।

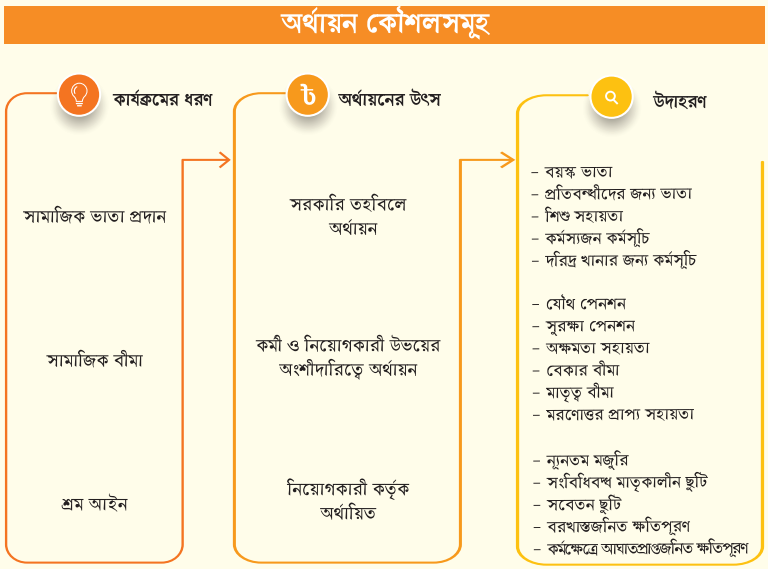

খ. সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার অর্থায়নে কৌশল নির্ধারণ: ২০২২-২৩ জাতীয় বাজেট থেকেই সরকার সর্বজনীন সুরক্ষায় অর্থায়নের একটা বহুমুখি কৌশল উপস্থাপন করতে পারেন, যা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত ও পর্যালোচনা করা হবে। কর-রাজস্বভিত্তিক, অনুদানভিত্তিক, বাজারভিত্তিক ও স্বঅংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থায়নের বহুমুখি সম্ভাব-না যাচাই করতে সব অংশীভাগিদের নিয়ে একটি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের অধীনে জাতীয় পরামর্শক কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কাবিখা, কাবিটা, ভিজিএফ, বয়স্ক ভাতার মতো কর্মসূচির পরিবর্তে জাতীয় সুরক্ষা কৌশলের লক্ষ্য অনুযায়ী জীবনচক্র-ভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রালয়ের অধীনে মা ও শিশু ভাতা, কর্মহীন ভাতা, সামাজিক বিমা ও পেনশন ভাতা চালু করা দরকার। এজন্য প্রাথমিকভাবে দরিদ্র ও নতুন করে ঝুঁকিগ্রস্ত ১ কোটি ৫০ লাখ পরিবারকে এর আওতাভুক্ত করা যেতে পারে। আগামি অর্থবছর থেকে ন্যূনতম ১২ মাস প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারকে মাসে কমপক্ষে ৫০০০ টাকা নগদ সহায়তা এবং নগর দরিদ্র পরিবারের জন্য মাসে কমপক্ষে ৮০০০ টাকা নগদ সহায়তা দেয়া প্রয়োজ-ন। এই কর্মসূচির জন্য ডিবিএম এর সুপারিশ অনুযায়ী ৫০ হাজার কোটি টাকার একটি প্রাথমিক তহবিল গঠন করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। একই লক্ষ্য অর্জনে তৈরি অন্যান্য ছোট ছোট কর্মসূচিগুলো ছাটাই করা যেতে পারে। তবে জাতীয় কৌশলপত্র অনুযায়ী প্রতিবন্ধি ভাতার মতো বিশেষায়িত সুবিধাগুলো স্ব-স্ব মন্ত্রালয়ের অধীনে চালু রাখা প্রয়োজন। একইসাথে সর্বজনীন সুরক্ষা পদ্ধতি চালু হলে অন্তর্ভুক্তি ও বিচ্যুতির ত্রুটিগুলো

অনেকাংশে পরিহার করা সম্ভব হবে।

গ. প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বীমা ও বেসরকারি খাতে পেনশন কর্মসূচি চালু করা: সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে সামাজিক বীমা ও বেসরকারিখাতে পেনশন কর্মসূচি চালু করা সময়ের দাবি। তবে সামাজিক বিমায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকার শুধু কর্মী ও নিয়োগকর্তার উপর সকল দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন না। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণেরও প্রয়োজন আছে। এজন্য ত্রিপাক্ষিক একটি সামাজিক বীমা কমিটি জাতীয় ভাবে আইন নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করতে পারে। স্ব-অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বীমার ক্ষেত্রে "মাইক্রো ইন্সুরেন্সের" অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো দরকার যেখানে স্কিমের খরচ-সুযোগ-সুবিধা ভোগের তুলনামূলক চিত্রে দরিদ্র পরিবারের কাঙ্খিত উপকার প্রমাণিত।

ঘ) **অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা** : অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা জনপ্রতি মাসিক ন্যূনতম ৫০০০ টাকায় উন্নীত করা। গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেমন- সেরিব্রাল পলেসি, অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, ডাউন সিনড্রোম, মেরুরজ্জুতে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যাদের সার্বক্ষণিক যত্নের প্রয়োজন হয় সেসকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কেয়ারগিভারের জন্য সামাজিক বীমা অথবা সামাজিক সহায়তার ব্যবস্থা করা।

ঙ) **কেন্দ্রীয় তথ্য ভান্ডার তৈরি:** সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির উপকারভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি। এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এনজিওসমূহকে কাজে লাগিয়ে ও জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভান্ডারের সাথে যোগসূত্র তৈরি করে একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার গড়ে তোলা দরকার যাতে মোবাইলের মাধ্যমে প্রতিমাসে/ প্রতি প্রান্তিকে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর করা সম্ভব হয়।[১৫]

---

১৫. 'https://gsdrc.org/topic-guides/social-protection/types-of-social-protection/
https://www.worldbank.org/en/topic/socialprotection/overview#1
https://www.cbpp.org/research/social-security/top-ten-facts-about-social-security
https://socialprotection.gov.bd/wp-content/uploads/2017/06/ABCD-of-Social-Protection-in-Bangladesh-Final-17-June-2017.pdf
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2018-2019/asia/bangladesh.html#:~:text=Qualifying%20Conditions,must%20not%20exceed%2010%2C000%20taka.

সর্বজনীনতার প্রশ্নে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি

■ সেকেন্দার আলী মিনা ও মুসফিকুর রহমান

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে ২০২০ সাল থেকে গোটা পৃথিবী শতাব্দীর ভয়াবহতম সময় পার করছে। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব এত মারাত্মক যে বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতিগুলো এখনও এর প্রভাব কাটিয়ে উঠতে লড়াই করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও ব্যতিক্রম নয়। বরং উন্নত বিশ্বের তুলনায় আমাদের অর্থনৈতিক এই অভিঘাত জনজীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের আপামর জনগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ কাজ হারিয়েছে, অনেকের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। বিশেষ করে নিম্নবিত্ত মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় নির্বাহ এখন চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন। তাই এমনি এক প্রেক্ষাপটে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচির মতো একটি উদ্যোগ একদিকে যেমন উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে তেমনি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার সূচক হিসেবে কাজ করবে। অন্যদিকে, উপমহাদেশে পেনশন ব্যবস্থা চালু হয় গত শতাব্দির শুরুর দিকে। তারও আগে ১৮৭১ সালে তৈরি হয় পেনশন অ্যাক্ট। সুতরাং বলা যায় পেনশনের ধারণা এ অঞ্চলে বেশ পুরোনো। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা এখন যে জায়গায় পৌঁছেছে তাতে সামাজিক অসমতা নিয়ে কাজ করার সঠিক সময় এখনই।

বাংলাদেশে মূলত সামরিক বেসামরিক রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারিরা পেনশন পান। এরকম মানুষদের পেনশন

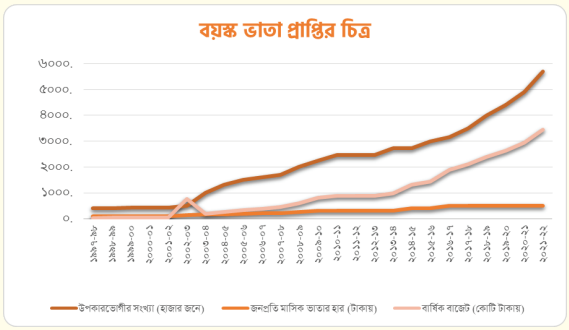

দেয়া হচ্ছে জনগণের করের অর্থ থেকেই। এই পেনশনারের সংখ্যা কমবেশি ১৪ লাখের মতো। এই জনগোষ্ঠীর অবসরভাতা দিতে সরকারের খরচ হয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রায় ৮-৯ ভাগ, যা জিডিপি'র প্রায় এক ভাগ। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ক্ষুদ্র এক অংশ গ্রাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুবিধা পান। এর বাইরে, ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত প্রায় ২৬২টি উপজেলায় ৬৫ উর্ধ্ব (নারী ৬২ বছর, পুরুষ ৬৫ বছর) ৫৭ লাখ ১ হাজার[১] মানুষ মাসে ৫০০ টাকা

হারে বয়স্ক ভাতা পেয়ে আসছেন। যদিও টাকার অঙ্কে এসব সামান্য এবং টাকার এই পরিমাণ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন।[২] এরকম সবাই মিলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় সেটা দেশের বয়স্ক জনসংখ্যার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। সরকার এখানে বয়স্কদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জাতীয় বাজেটে যে অর্থ ব্যয় করে তার বড় অংশই যায় অল্প সংখ্যক মানুষের পেনশনে, টাকার অংকে যা প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। এসব কারণেই, দীর্ঘদিন থেকে পেনশনের মতো ব্যবস্থা সর্বজনীন করার জন্য দাবি রয়েছে।

লেখচিত্র ১: ২০০০-২১০০ সালে অনুমিত জনসংখ্যা

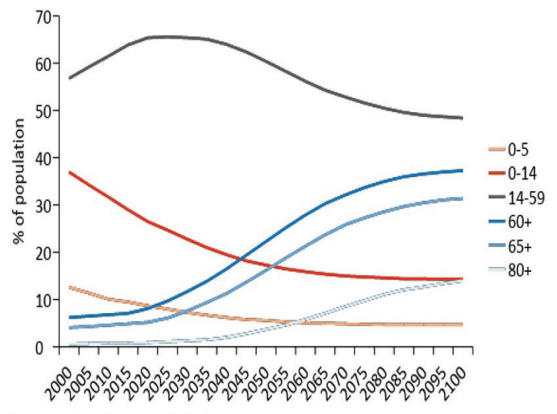

উৎস: *Khondker et el (2014)*

কেন পেনশন জরুরি

জনসংখ্যাগত কারণ : বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৫-এর বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ৮০-৯০ লাখ। ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা এক কোটির বেশি এবং দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর হার দ্রুত বাড়ছে। মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্যও বাড়ছে। গড় আয়ু ইতোমধ্যে ৭০ বছর অতিক্রম করেছে। বৈশ্বিক মানদন্ডে বর্তমানে ৬৫ উর্ধ্ব মানুষের হিস্যায় বাংলাদেশ কিছুটা পিছিয়ে থাকলেও শিগগির অবস্থা পাল্টে যাবে। ২০৫০ নাগাদ এখানে মানুষ সক্রিয় কর্মজীবন শেষেও অন্তত ২০ বছর সমান বাঁচবে। গবেষকরা ধারণা করছেন যে, ২০৫০ সাল নাগাদ ৬০ উর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর ২৩%-এ এবং ৫০ বছর উর্ধ্ব মানুষের সংখ্যা ৩২%-এ গিয়ে দাঁড়াবে[৩]। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর বড় অংশই জীবনভর অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেছেন। সরকারি চাকুরি করে প্রবীণ হয়েছেন এমন মানুষ মোট প্রবীণের অতি নগণ্য অংশ, সংখ্যার হিসাবে যা মোট জনশক্তির ১% এবং মোট প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ৫%[৪]। অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রবীণই কর্মজীবন শেষে পেনশনধর্মী কোনো সুরক্ষা পাচ্ছেন না। কর্মজীবন শেষ মানেই আর্থিকভাবে সুরক্ষাহীন। যারা বয়স্ক ভাতা বা অনুরূপ কোন ভাতা পান- সেটিও পেনশনের বিকল্প হওয়ার মতো নয়, মাত্র কয়েক শত টাকা পাওয়া যায় তাতে, যা দিয়ে বর্তমান বাজারে ১-২ দিন চলা যায় মাত্র। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রে বয়স্ক ভাতাকে বয়স্কদের আয় নিরাপত্তা বিধানে 'খুবই সামান্য' বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে বয়স্ক ভাতা হিসেবে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয় তা মাথাপিছু জিডিপির শতাংশ হিসেবে বিশ্বে সর্বনিম্ন[৫]। ফলে দেশের প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মূল অংশ শেষ বয়সে কার্যত স্থায়ীভাবে আর্থিক ঝুঁকিতে থাকেন। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনদের জন্য এই ঝুঁকি পরিবারের জন্য ভয়াবহ এক অবস্থা তৈরি করছে।

নীতিমালাগত কারণ : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৫ সকল নাগরিকের সামাজিক নিরাপত্তা সংরক্ষণ করে। অন্যদিকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালায় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থার আভাস দেয়া হয়েছে। এছাড়া বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ ২০১৮-এর নির্বাচনী ইশতেহারে জাতীয় সামাজিক

১. সমাজসেবা অধিদপ্তর: http://www.dss.gov-.bd/site/page/7314930b-3f4b-4f90-9605-886c36ff423a/%E0%A6%AC%E0%A7%9F%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
২. https://www.thedailystar.net/round-tables/old-age-allowance-right-not-charity-1441162
৩. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ
৪. Bangladesh - Cash Transfer Modernization Project (English). Washington, D.C. : World Bank Group.
৫. সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ, পৃষ্ঠা ৫৪

বীমার মতো বিষয় প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। 'কাউকে পিছনে রাখা যাবে না' এসডিজি'র এই মূলমন্ত্র হিসেবে সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচি কোন বিকল্প নাই। বস্তুত এসডিজি'র ৫টি টার্গেট ১.৩, ৩.৮, ৫.৪, ৮.৫ এবং ১০.৪ –এই সামাজিক নিরাপত্তার সাথে যুক্ত।

নীতি নির্ধারকদের অঙ্গীকার ও সর্বশেষ অগ্রগতি : বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে সর্বজনীন পেনশন নিয়ে কথা হচ্ছে। বিষয়টি সম্পর্কে আগে বেশ কয়েকজন অর্থমন্ত্রীরাও বিভিন্ন সময় ইতিবাচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সর্বশেষ ২০২১-এর জানুয়ারিতে সাংবাদিকদের এক অনুষ্ঠানে পরিকল্পন-মন্ত্রী এম. এ. মান্নান বলেছিলেন, সাংবাদিকসহ দেশের সব নাগরিককে পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার কাজ চলছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষ পেনশন-এর আওতাভুক্ত হবেন।' সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে 'সাম্য' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও এ 'স্বপ্ন' বাস্তবায়নের কথা বলেছিলেন দায়িত্বে থাকার সময়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদও বলেছিলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য একটি 'সর্বজনীন পেনশন স্কিম' চালুর জন্য এখনই উপযুক্ত সময়।

তবে ইতিবাচক বিষয় হলো ইতিমধ্যে (এপ্রিল, ২০২২) সরকার জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০২২ নামে একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করেছে। সরকারি ভাষ্য মতে, ১৮ থেকে ৫০ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশী সব নাগরিক এই পেনশন ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারবেন। বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী কর্মীরা অংশ নিতে পারবেন। সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই পেনশন ব্যবস্থাপনার বাইরে থাকবেন। খসড়া অনুযায়ী, একজন নির্বাহী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ গঠিত হবে। নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সদস্যরা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। এছাড়া অর্থমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি গভর্নিং বোর্ড গঠন করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থবিভাগের সচিব, এনবিআর চেয়ারম্যান, সমাজ কল্যাণ সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশি কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শ্রম সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব, প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড একচেঞ্জ কমিশনের সচিব, এফবিসিসিআই সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লোয়ার্স ফেডারেশনের সচিব, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি ও পেনশন কর্তৃপক্ষের নির্বাহী সভাপতি এই বোর্ডের সদস্য হবেন। এখন প্রশ্ন হলো, যাদের জন্য এই আইন তাদের প্রতিনিধিত্ব অর্থাৎ

শ্রমিক-কর্মচারী ও অন্যান্য নাগরিক সমাজের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বোর্ডে নেই। এখানে শ্রম আইন প্রণয়ন ও ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের গঠন একটি উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। শ্রম আইন প্রণয়ন-এর শুরু থেকে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীকে যুক্ত করা হয়। বিভিন্ন পরামর্শসভা এবং দীর্ঘ একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করে এ আইন প্রণয়ন করা হয়। গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলনসহ বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন দীর্ঘদিন ধরে বাজেট প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের দাবি তুলে আসছে। জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়া তাই এই আইন তার সর্বজনীনতা ধরে রাখতে পারবে না।

সর্বজনীন পেনশনের ধারণায় কারা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা চালু হয়েছে এবং হচ্ছে।

এটির একক কোনো মডেল নেই। বাংলাদেশে বিভিন্ন আলোচনায় সর্বজনীন পেনশনের ধারণার যে সাধারণ রূপটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো– যারা বেসরকারি খাতে কাজ করেন তারা জাতীয়ভাবে গঠিত একটা তহবিলে নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ দেবেন। এরকম কিস্তি হারের সর্বনিম্ন অংক নির্ধারিত থাকবে। যারা কোনো মানুষকে কাজে নিচ্ছেন সেই মালিক গোষ্ঠীও তহবিলে কিছু অর্থ বরাদ্দ করতে থাকবে। যারা নিজেরা 'সেলফ এমপ্লয়েড' বা আত্ম-কর্মসংস্থানে আছেন তারা এবং সরকারও এতে নির্দিষ্ট হারে অর্থ যোগ করবে। এভাবে যে তহবিল হবে সেটি বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করা হবে। সেখানেও কিছু অর্থ যোগ হবে। এরপর তহবিলের একজন সদস্য যখন অবসরে যাবেন তখন তিনি তহবিলের সদস্য হিসেবে হিসাবমতো সুবিধা পাবেন। কমপক্ষে ১০ বছর চাঁদা দিলে এরকম কর্মসূচির একজন সদস্য পেনশন পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে সেটা সম্ভবত ৬০ বছর বয়সের পর থেকে শুরু হবে। ৭৫ বছর বয়সের আগে মারা গেলে 'নমিনি'রা সেই সুবিধা পাবেন। তবে ইতোমধ্যে নাগরিক সমাজের অনেকেই এই বিষয়ে বিভিন্ন সময় কিছু প্রস্তাব রেখেছেন। যেমন, এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ ২০২১ সালের ২৯ মে দৈনিক প্রথম আলোতে যে প্রস্তাব রেখেছেন তার চুম্বক অংশ ছিল এরকম: জাতীয় পরিচয়পত্রধারী সব নাগরিকের দেশে একটা টিআইএন থাকতে পারে। থাকতে হবে একটি সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বরও। প্রত্যেক কর্মক্ষম নাগরিককে প্রতি বছর ন্যূনতম একটি অঙ্কের আয়কর বা জাতীয় পেনশন প্রিমিয়াম দিতে হবে, যা নিম্নতম পর্যায়ে আয়ের ১ থেকে ৫ শতাংশে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। এ কন্ট্রিবিউশন সরাসরি তাঁদের পেনশন কন্ট্রিবিউশন হিসেবে পেনশন ফান্ডে জমা হবে। অন্যান্য নানা আয়ের মানুষের প্রদেয় আয়করের একটি অংশ তাদের পেনশন কন্ট্রিবিউশন হিসেবে সরকারের পেনশন ফান্ডে চলে যাবে। আয়কর থেকে পেনশন তহবিলে স্থানান্তরের সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে ৫ শতাংশ। আয়করের পেনশন কন্ট্রিবিউশনের আনুপাতিক হারে কর প্রদানকারী কর্মজীবন শেষে পেনশন পাবেন। এভাবে জনসংখ্যার ২৫ বছরের নিচের এবং ৬২ বছরের ওপরের অংশ বাদে সবাই এই প্রিমিয়াম বা ট্যাক্স নেটে আসবেন। এভাবে দেশের কমবেশি পাঁচ কোটি মানুষ প্রতিবছর সরকারকে কর দেবে এবং পেনশন তহবিলে কন্ট্রিবিউট করবে। জনপ্রতি

জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলপত্র: প্রস্তাবিত ৪ পেনশন মডেল

১	২	৩	৪
বয়স্ক ভাতা	**সরকারি কর্মচারীদের পেনশন**	**জাতীয় সামাজিক বীমা স্কিম**	**বেসরকারি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন**
২০১৫-১৬ থেকে মাসিক ৫০০ টাকা। বয়স ৯০ ছাড়িয়ে গেলে ৩০০০টাকা	সরকারি কর্মচারীদের পেনশন আগের মতোই চলবে	নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়ের অংশীদারিত্বে এ স্কিম চালু করার সম্ভাবনা আছে	পেশা এবং কর্মসংস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন
বয়স্ক ভাতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থায়িত হবে	সরকারি চাকুরিজীবীর পেনশনের অর্থায়ন বাজেট থেকে করা হবে	বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে	বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে

গড়পড়তা ৫০০ টাকা ধরলেও তা বছরে ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা হবে। সরকার আয়করবহির্ভূত রাজস্ব থেকে সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করবে। এভাবে প্রতিবছর ৫ হাজার কোটি করে পাঁচ বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকার একটি তহবিল সৃষ্টি করে সর্বজনীন নাগরিক পেনশন ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করতে পারে।'

আমরা জানি যে, জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলে সরকার বয়স্কদের জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট পেনশন ব্যবস্থার কথা বলেছেন। তাই এই কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত জনগোষ্ঠী নির্ধারণ করা এখন সময়ের দাবি। আমরা যদি জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল খেয়াল করি তাহলে দেখবো যে সেখানে ৪ ধরনের পেনশনের কথা বলা হয়েছে। প্রথম ২টি ব্যবস্থার অর্থায়ন বাজেট থেকে হবে। প্রথম আর দ্বিতীয়তে আছে বয়স্কভাতার উপকারভোগী এবং সরকারি কর্মচারীগণ। কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখতে পাব যে, তৃতীয় এবং চতুর্থ সারির জনগোষ্ঠী অন্যান্যদের তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় আছেন। আর তারা হলেন বেসরকারি চাকুরিজীবী থেকে শুরু করে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দিনমজুর, কৃষক, ক্ষুদ্র পেশায় নিয়োজিত জনগোষ্ঠীসহ সকল শ্রমিক-কর্মচারী। সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এই দুই সারির পেশাজীবীদের সর্বজনীন পেনশন কর্মসূচিতে প্রাধান্যের ভিত্তিতে অর্ন্তভুক্ত করতে না পারলে এই কর্মসূচি চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বজনীন হবে না। এক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হলো এই কর্মসূচিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মীদের দিকে বিশেষ মনযোগ দেয়া হোক। এই কর্মসূচির জন্য যে আইনী কাঠামো এবং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ তৈরি করা হচ্ছে তাতেই ঐ অগ্রাধিকারের ছাপ থাকা উচিত। এবারের বাজেটেই আইনী ঐ স্বরূপ ও এই কর্মসূচির সম্ভাব্য স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়গুলো খোলাসা করতে হবে। এছাড়া এ ধরনের প্রকল্পের পরিচালন ব্যয় যাতে সীমিত থাকে এবং পরিচালনার কাঠামোতে যাতে জন-অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে সেটাও বিবেচনায় রাখাটা এখন সময়ের দাবি।

কার্টুন : দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

কেন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পেশাজীবীদের সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিতে হবে

বর্তমানে ৬৫ উর্ধ্ব মানুষের মাঝে দারিদ্র্যের সংখ্যা প্রায় ২৫ শতাংশ । অর্থনীতির এই ধারাবাহিকতা বহাল থাকলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের পরিবারগুলোর অবস্থা সামনের দিনগুলোতে আরো কঠিন হয়ে উঠবে। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেরই নিত্যদিনের মৌলিক চাহিদা পূরণ কঠিন হয়ে উঠছে এবং আরও উঠবে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এখনি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত পরিবারগুলোতে ৫৫ উর্ধ্বদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের হার কম। কারণ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই বয়সে কাজ পাওয়াটা একটা চ্যালেঞ্জ।

একজন রিকশাচালক কিংবা ক্ষুদ্র দোকানদার সারা বছর পরিশ্রম করে জীবন সায়হ্নে কেন অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় থাকবেন এবং অপরের বোঝা হবেন? কোটি কোটি কৃষক যুগের পর যুগ দেশের খাদ্য নিরাপত্তার মূল চাবিকাঠি হয়ে কেন পেনশনধর্মী কোন সুবিধা পাবেন না? এরকম প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যেয়েই সর্বজনীন পেনশনের ধারণার চর্চা ও অনুশীলন চলছে বিশ্ব জুড়ে। তবে এরকম কর্মসূচি চালু হলেই যে মানুষ

যুক্ত হবে তা নাও হতে পারে। বিশেষ করে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কালে কত বছর ধরে কত টাকা দিলে বৃদ্ধ বয়সে কত পাবে সেই হিসাবটা করবে মানুষ। সরকার এক্ষেত্রে একই সঙ্গে ৩০-৪০ বছর পরের বাজার পরিস্থিতি বিবেচনা করে দরিদ্র-বান্ধব অবস্থান নিবে বলে সবাই আশা করছে।

শ্রমিকদের কীভাবে এই কর্মসূচিতে সহজে যুক্ত করা সম্ভব?

সর্বজনীন পেনশন বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক মনোভাবের পরই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে এই কর্মসূচির ধরন ও নিয়ম-কানুন নিয়ে। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো সমাজের দরিদ্র মানুষ এবং বর্তমানে পেনশন-গ্রাচুইটি ইত্যাদির আওতা বহির্ভুক্ত শ্রমজীবীদের কীভাবে এই কর্মসূচিতে নিয়ে আসা যাবে। মূলত এই মানুষদের 'ইউনিভার্সাল পেনশ-ন'-এ নিয়ে আসা না গেলে এই কর্মসূচির প্রধান সামাজিক লক্ষ্যই ব্যর্থ হতে পারে। কারণ সমাজের সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর পেনশন না পেলেও চলে। প্রস্তাবিত পেনশন কর্মসূচি সকল অর্থেই মূলত নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীন শ্রমজীবীদের অগ্রাধিকার দিয়ে করতে হবে। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবীদের তাৎক্ষণিকভাবে দুটি বিষয় দরকার। প্রথমত তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র বা জাতীয় কোন ডেটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এরকম মানুষদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি হার নির্ধারণ।

সম্ভাব্য পেনশন কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়ার জন্য পরিচয়পত্র লাগবে এবং টাকার ন্যূনতম একটা নিয়মিত কিস্তি লাগবে। এই দুই ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রস্তুত না থাকলে তারা এই কর্মসূচির সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু বর্তমান বাজারে বর্তমান মজুরি হারে শ্রমিকদের পক্ষে পেনশন কর্মসূচির জন্য নিয়মিত কিছু টাকা আলাদা করে রাখা দুঃসাধ্য হবে। এরকম অবস্থায় তাদের মজুরি হারের ন্যূনতম মাত্রাটা বাড়ানো দরকার জরুরি ভিত্তিতে। এছাড়া কিস্তি পরিশোধে কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটলে তার জরিমানা নীতিও নমণীয় হওয়া প্রয়োজন এবং সর্বপরি কিস্তির অংক থাকতে হবে অল্প। ভারতের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি এরকম প্রকল্পে অসংগঠিত খাতের শ্রমিকদের জন্য ১০০ রুপির নীচেও কিস্তির সুযোগ রয়েছে।

সর্বজনীন পেনশন স্কিমে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিবে হবে

১. অতিসত্তর জনসাধারণের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায় "সর্বজনীন পেনশন স্কিম আইন" প্রণয়ন করতে হবে। আইন প্রণয়নে জনগণকে যুক্ত করা ও এ আইন বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিধি-প্রবিধি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা বা নির্দেশনা প্রণয়নে উপযুক্ত বরাদ্দ আসছে বাজেটে থাকতে হবে।

২. সদ্য প্রতিষ্ঠিত 'জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ'-এর কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল তথ্য বিনিময়সহ প্রয়োজনীয় বিধান করতে হবে।

৩. পেনশন স্কিম ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক উপযুক্ত গাইডলাইন তৈরি করতে হবে যাতে করে এ স্কিমের অর্থ অপচয় রোধ করা যায়।

৪. পেনশন স্কিমের সুবিধাভোগীদের নির্বাচনে উপযুক্ত মানদন্ড নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে যারা সুবিধা পাচ্ছে তাদেরকে বাড়তি সুবিধা পাওয়া থেকে প্রতিরোধ করা যায়।

৫. পেনশন স্কিম সম্পর্কিত তথ্যাদি সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করতে হবে যাতে করে স্কিম বিষয়ক কোন ধূম্রজাল তৈরি না হয় এবং সকলে সহজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

খাতভিত্তিক আলোচনাপত্র

কৃষি বাজেটে চাই ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সহায়ক নীতি সুরক্ষা

■ কৃষিবিদ শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি, তৈরি পোশাক, ও রেমিট্যান্সের ওপর দাঁড়িয়ে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পথ পাড়ি দিচ্ছে। অন্য খাতগুলোর তুলনায় জিডিপিতে কৃষিখাতের ক্রমহ্রাসমান অবদান সত্ত্বেও বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান এখনও সর্বাধিক। বিশ্বব্যাংকের হিসাব মতে বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৬২ ভাগ[১] মানুষের জীবন-জীবিকা এখনও কোনো না কোনো ভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৬-১৭)[২] এর হিসাব মতে, দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪০.৪ শতাংশ এখনো কৃষিতে নিয়োজিত আছে যারা দেশের পিছিয়েপড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর অংশ এবং যাদের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন কৃষির উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। কিন্তু প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার বাড়লেও তাতে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট খাত সমূহের বরাদ্দ ক্রমহ্রাসমান, যা অত্যন্ত হতাশাজনক।

দেশের অর্থনীতিতে করোনার অভিঘাত এখনও ব্যাপকভাবে বিরাজমান। তদুপরি, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা রূপে আবির্ভূত হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, যার নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বেই ব্যাপকতর হচ্ছে। সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রভাব দেখা দিচ্ছে বৈশ্বিক খাদ্য বাজারে। এমনিতেই খাদ্যদ্রব্যসহ প্রায় সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে জনজীবন অতিষ্ট। এমতাবস্থায়, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা তথা সম্ভাব্য খাদ্য সংকট বিবেচনায় আসন্ন বাজেটে কৃষিখাত বাড়তি মনোযোগ দাবি রাখে। কারণ, সকল সংকটকালে কৃষিই আমাদের রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যানুসারে করোনাকালে দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়লেও বেশিরভাগ মানুষের আয় কমেছে, বেড়েছে দারিদ্র্য এবং অসমতা। কিন্তু এই মহামারীকালে চরম খাদ্য ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে একমাত্র আশার প্রদীপ জাগিয়ে রেখেছিল দেশের কৃষিখাত। বিগত বছরগুলোর বাজেট বক্তৃতাসহ সকল অর্থনৈতিক দলিল এবং আলোচনায় কৃষিখাত এখনও

১. বিশ্বব্যাংক, ২০২০; http://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS

২. http://www.bbs.gov-.bd/site/page/111d09ce-718a-4ae6-8188-f7d938ada348/Labor-&-Employment

মোট জাতীয় বাজেট (কোটি টাকায়)

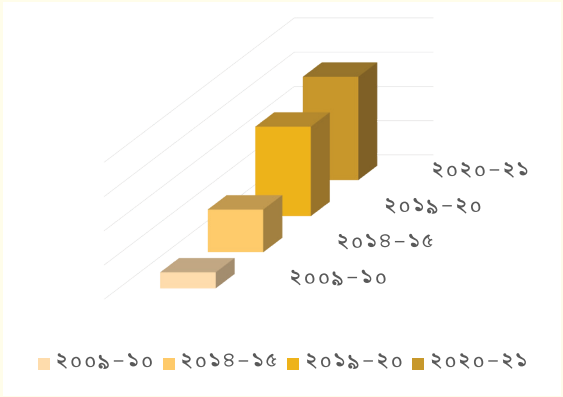

কৃষিখাতের বাজেট [মোট বাজেটের শতকরা হার] (কোটি টাকায়)

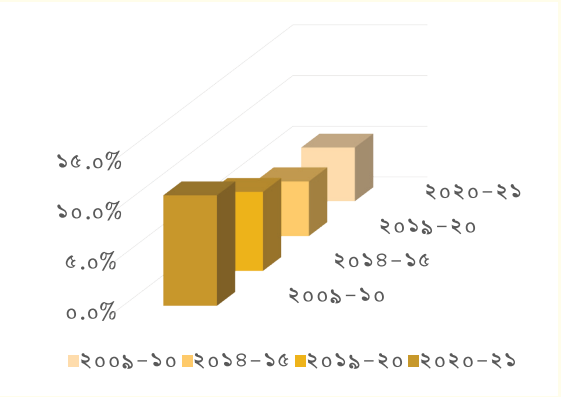

নীতি নির্ধারক মহলে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবেই বিবেচিত হতে দেখা যায়। অথচ বিগত বছরগুলোর বাজেট পর্যালোচনা করলে হতাশাজনক চিত্রই ফুটে উঠে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে যখন জাতীয় বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৯৪ হাজার কোটি টাকা, তা ২০২১-২২ অর্থ বছরে বেড়ে ৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, ২০০৯-১০ অর্থবছরে জাতীয় বাজেটে কৃষি ও তৎসংশ্লিষ্ট খাতের অংশ ছিল মোট বাজেটের ১০.৯%, যা চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে মাত্র ৫.৩ শতাংশে নেমে এসেছে; যেটি অবস্থান বাজেটের ১৫টি খাতের মধ্যে নবমতম। কাজেই, কেতাবে যা-ই বলা বা লেখা হোক না কেন জাতীয় বাজেটে কৃষিখাত বরাবরই উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত থেকেছে ক্ষুদ্রচাষীর (ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক একসাথে) স্বার্থ, যারা কৃষক জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ।[৩]

করোনাকালীন সময়ে সরকার কৃষিখাতের জন্য ৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রণোদনা ঘোষণা করলেও তার সুফল ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের ঘরে তেমন একটি পৌঁছেছে বলে জানা যায়নি। অথচ দেশের প্রধান খাদ্য যোগানদাতা হয়েও- তাঁরাই আবার দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সিংহভাগের প্রতিনিধিত্ব করে এবং সর্বাধিক খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন।

৩. HIES 2016 (সম্পূর্ণ ভূমিহীন=০.০-০.৪৯ একর, প্রান্তিক =০.৫০-.৯৯ একর, ক্ষুদ্র=১.০-২.৪৯ একর, মাঝারি=২.৫-৭.৪৯ একর, বড়=৭.৫ একর বা তার বেশি জমির মালিক)

বর্তমান সরকার কর্তৃক ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী ইশতেহারে এবং ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরবর্তী বাজেট থেকেই কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের বিকাশকে আগ্রাধিকার দেয়, যা নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বেশ আশা জাগিয়েছিল। কারণ, জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক শীর্ষে থাকা গ্রামপ্রধান এবং কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের জন্য কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং এসএমই খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। সেই সময় সরকারের পক্ষ থেকে খাদ্য নিরাপত্তাকেও সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল যার সুফল হিসেবে দেশ আজ খাদ্যে (যদিও মূলত দানাজাতীয় খাদ্যে এবং এখনও আমদানি নির্ভরতা আছে) স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দেশে ফসল, ফল ও মৎস্যসহ কৃষি উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকের চাপে গৃহীত ভ্রান্ত নীতির ফলস্বরূপ মৃতপ্রায় পাটখাতের পুনরুজ্জীবনে সরকার বেশকিছু ভাল পদক্ষেপ নিয়েছিল। দেশের কৃষির স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে "একটি বাড়ি একটি খামার" ও "সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রকল্প"-এর মত বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছিল। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে "বাংলাদেশ কান্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট প্লান (সিআইপি ২০০৯) প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সরকারের এসব উদ্যোগ সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য হলেও প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে সেগুলো যথেষ্ট পরিমাণ সুফল দিতে পারেনি।

এটা অনস্বীকার্য যে, সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষির বাণিজ্যিকায়নের নীতির ফলেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির

ক্ষেত্রে এমন সাফল্য এসেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এরূপ সাফল্যের পিছনে কৃষকের প্রাণান্ত পরিশ্রম এবং অসামান্য অবদানকে অনেকসময় গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়না। তাছাড়া, সরকারি এসব নীতি কৃষিবান্ধব বলা হলেও কতটা কৃষকবান্ধব সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কারণ, সমস্ত সরকারি নীতি ও পরিকল্পনার সুফল বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসায়িদের ঘরে উঠতে দেখা যাচ্ছে। পক্ষান্তরে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে যাদের মুখ্য অবদান সেই ক্ষুদ্র কৃষক ক্রমাগতভাবে তার উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। দেশের ব্যবসায়ি মহল এবং বৈদেশিক দাতা দেশ ও সংস্থাগুলোর পরামর্শে বা চাপে গৃহীত নীতির (যেমন, ভর্তুকি দিতে বারণ করা এবং মুক্ত বাজার নীতি অনুসরণে বাধ্য করা যদিও তারা নিজেরাই তা করেনা) ফলে অবাধ বাণিজ্যের প্রতিযোগীতায় ক্ষুদ্র কৃষকেরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদন বাড়লেও উৎপাদন উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির ফলে কৃষক কৃষি থেকে কদাচিৎ লাভ পায়। সুখবর হচ্ছে গত দুই বছর যাবৎ উৎপাদন মৌসুমেও কৃষকরা ধানের ভালো দাম পেয়েছে। অবশ্য কৃষকদের এই সামান্য লাভের অনেক বেশি খেসারত দিতে হয়েছে দরিদ্র ভোক্তাদেরকেই। কারণ, সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রিত চালের বাজার এখন এতটাই আকাশচুম্বি হয়েছে- যা ধানের বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষির সামগ্রিক নীতি ও পরিকল্পনায় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এসব নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে খামার ভিত্তিক চাষাবাদকে উৎসাহিত করেছে যেমন: পোল্ট্রি খামার, মৎস্য খামার, দুগ্ধ খামার ইত্যাদি। বিদেশি ও হাইব্রিড জাত নির্ভর এরূপ খামারভিত্তিক চাষাবাদে (ইংরেজিতে যাকে মনোকালচার বলা হয়) বিপন্ন হচ্ছে দেশের হাজার বছরের স্থায়িত্বশীল, সমন্বিত এবং জৈব কৃষি। ধ্বংস হচ্ছে জীববৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম যা আমাদের জলবায়ু সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে তুলছে। বিপন্ন হচ্ছে মাটির স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মানব স্বাস্থ্য। আজ আমাদের ক্রমবর্ধমান ও অপরিসীম ক্ষুধা মিটাতে গিয়ে যে কৃষিকে আমরা খোরপোশের কৃষি বা সাবসিস্টেন্স ফার্মিং আখ্যা দিয়ে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিচ্ছি তার খেসারত নিশ্চয় একদিন আমাদেরকে দিতে হবে যদিও সেদিন হয়ত করণীয়টা খুব বেশি কঠিন হয়ে উঠবে। এরূপ বাণিজ্যিক কৃষির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকরা। একদিকে জলবায়ু সহনশীল ও স্থায়িত্বশীল কৃষির কথা বলা হলেও "হাই ইনপুট- হাই আউটপুট" কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কৃষি অর্থনীতির "ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি" বিবেচনায় নিলে এরূপ কৃষি স্বল্পমেয়াদে বেশি উৎপাদনশীল মনে হলেও দীর্ঘমেয়াদে স্থায়িত্বশীল নয়। কারণ, কৃষি উৎপাদন উপকরণ (যেমন: রাসায়নিক সার, বালাইনাশক, হরমোন, ভিটামিন ইত্যাদি)-এর ব্যবহার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করার ফলে একটা পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদন বাড়লেও একসময় স্থিতাবস্থায় পৌছানোর পর প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষি আর কৃষকের জন্য লাভজনক থাকেনা। এমন কৃষি ব্যবস্থায় কৃষি উপকরণ সরবরাহকারি কোম্পানি এবং ব্যবসায়িরা ব্যাপকভাবে লাভবান হলেও খোদ কৃষক লাভবান হয় না।

অন্যদিকে, বাণিজ্যিক কৃষিতে উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থার কোথাও খোদ কৃষকের কোন নিয়ন্ত্রণ দূরে থাকুক সামান্য প্রভাবটুকুও দেখা যায় না। একমাত্র কৃষি ছাড়া অন্য সকল নিত্যভোগ্য এমনকি বিলাসপণ্যের মূল্যও উৎপাদক স্বয়ং কিংবা সরকার-উৎপাদক মিলে নির্ধারণ করলেও কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে কৃষকের কণামাত্র ভূমিকা থাকেনা। অথচ আজ আমরা যে কৃষি দেখছি সেটা মূলত শিল্পকৃষি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্রিকালচার) যদিও এটিই সম্ভবত একমাত্র শিল্প যেখানে উৎপাদক মালিক না হয়ে মূলত শ্রমিকের ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষির প্রাণপঙ্ক হলো বীজ, যা আজ কোম্পানি-ব্যবসায়িদের নিয়ন্ত্রণে। সারের উৎপাদন ও আমদানি বিসিআইসির নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বালাইনাশকের বাজার পুরোপুরি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে। উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে পোল্ট্রির বাজারের নিয়ন্ত্রণ প্রায় কোম্পানির হাতে কুক্ষিগত। খাদ্যপণ্যের প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি বৃহৎ অটো রাইস-মিলের আগ্রাসনে লক্ষ লক্ষ চাতালকল, যেখানে বিপুল পরিমাণ নারীরা কাজ করতো, আজ ক্রমশ বিলীন হচ্ছে। ফলে খাদ্যমূল্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা

খোদ সরকারের হাতেও থাকছে না। আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা বৃহৎ বা বহুজাতিক কোম্পানির হাতে কুক্ষিগত হলে তা কত ভয়াবহ হতে পারে তা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে এই বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। অমর্ত্য সেন আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন কোম্পানি-ব্যবসায়িরা কিভাবে মুনাফার লোভে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতেও কুণ্ঠিত হয়না।

কৃষির স্থায়িত্বশীলতা এবং ক্ষুদ্র কৃষকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের কৃষি এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই ক্রান্তিকাল বুঝার জন্য দেশের পোল্ট্রিখাতকে উদাহরণ

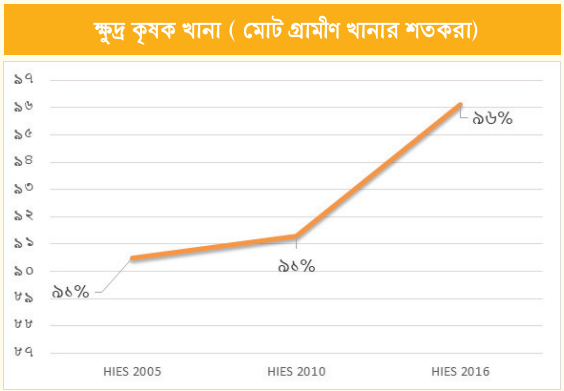

হিসেবে সামনে আনা যেতে পারে। দেশে কয়েক দশক আগে বিদেশি প্রজাতি নির্ভর পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশ শুরু হয়েছিল ক্ষুদ্র খামারিদের হাত ধরে- যারা মূলত ৫০, ১০০ বা ২০০ মুরগীর ক্ষুদ্র খামার গড়ে তুলেছিল। তখন সেটি তাঁদের জন্য লাভজনকই ছিল। কিন্তু খাদ্য, ঔষধপত্র এবং অন্যান্য উপকরণের মূল্য এবং রোগব্যাধিসহ নানাবিধ সমস্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলাতে না পেরে তারা আজ বিলীন হয়ে গেছে। এরপর ক্রমেই মাঝারি উদ্যোক্তারা পোল্ট্রি শিল্পের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তারাও আজ টিকে থাকতে হিমশিম খাচ্ছে। ক্রমেই দেশের পোল্ট্রি শিল্প সিপি বাংলাদেশ, নিউ হোপ-এর মত দেশি-বিদেশি বৃহৎ কোম্পানির কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে। একইভাবে দেশের মৎস্যখাত এবং শস্যখাতও ক্রমশ কৃষকের হাত থেকে সরে গিয়ে দেশি-বিদেশি কোম্পানি কিংবা পুঁজিপতি কৃষি উদ্যোক্তাদের হাতে চলে যাচ্ছে আর প্রকৃত কৃষকেরা হয় কৃষিশ্রমিকে অথবা গ্রামীণ অকৃষি পেশা কিংবা শহরে নির্মাণ শ্রমিক কিংবা ভ্যান-রিক্স-অটো চালকে পরিণত হচ্ছে। অন্যদিকে, দেশ তার খাদ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ দেশি-বিদেশি কোম্পানির কুক্ষিগত হয়ে পড়ার মারাত্মক ঝুকির মধ্যে পতিত হতে যাচ্ছে।

এটি সত্য যে, বর্তমানে যত সংখ্যক মানুষ কৃষিতে সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদেরকে কৃষিতে রেখে সবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। কাজেই কৃষি থেকে অনেক মানুষ বিচ্যুত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যারা কৃষিতে থেকে যাবে কিংবা আগামী প্রজন্মের যারা কৃষিতে আসবে তাদের জন্য আকর্ষনীয় এবং সন্মানীয় পেশা হিসেবে কৃষিকে উপস্থাপন করতে না পারলে আমাদের খাদ্য উৎপাদন তথা খাদ্য নিরাপত্তা ক্রমশ আরও নাজুক অবস্থায় উপনীত হবে। কাজেই কৃষিকে কৃষকের জন্য লাভজনক করতে না পারলে নতুন প্রজন্ম কৃষিতে আসতে চাইবেনা।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেবল খাদ্য উৎপাদন বাড়ালেই যেমন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় না- তেমনি কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ঘটে না যদি না কৃষক তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায়। কিন্তু বিগত বাজেটগুলোতে কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার পদক্ষেপ হিসেবে 'কৃষক বিপণন দল' ও 'কৃষক ক্লাব' গঠন এবং গ্রোয়ার্স মার্কেট স্থাপনের যে সাফল্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে তা প্রকৃতপ্রস্তাবে কতটা সফল তা নিয়ে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। কৃষির ঢালাও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে এবং ত্রুটিপূর্ণ বর্তমান মুক্ত-বাজার ব্যবস্থায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষক যা উৎপাদন করে তার লভ্যাংশটুকু লুটেপুটে নেয় মধ্যস্বত্বভোগীরা যেখানে কৃষক তার উৎপাদন ব্যয়টাও উঠাতে পারে না। অন্যদিকে, ভর্তুকি বা ঋণ হিসেবে যা বরাদ্দ দেওয়া হয় তাও লুটেপুটে নেয় একশ্রেণীর সুবিধাভোগীরা। কাজেই, শুধু কিছু গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ করে কিংবা রাসায়নিক সারে কিছু ভর্তুকী দিয়েই এই জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন বর্তমান বাজার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার যার কোন দিকনির্দেশনা বিগত বাজেটগুলোতে পাওয়া যায়নি।

অন্যদিকে, দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হলেও

খাদ্য নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা আজও সুদূর পরাহত। কারণ, খাদ্য উৎপাদনে রাসায়নিক সার ও বালাইনাশকের ব্যবহার কিছুটা কমেছে বলে দাবী করা হলেও দেশের কৃষিতে এখনও প্রায় ৪০ লাখ টন রাসায়নিক সার ও প্রায় ৩৭ হাজার টন রাসায়নিক বালাইনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে, মানুষ আজ পেট পুরে খেতে পারলেও "পুষ্টিহীনতাজনিত গুপ্ত ক্ষুধা (হিডেন হাঙ্গার)"-এ ভুগছে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ। আর বিষাক্ত খাবার খেয়ে বাড়ছে রোগব্যাধি, বিপন্ন হচ্ছে মানবস্বাস্থ্য। সরকার একটি জৈবকৃষি নীতি প্রণয়ন করলেও তা বাস্তবায়নের তেমন কোন উদ্যোগ চোখে পড়েনা। দেশে আজও জৈব খাদ্যের কোন মানদন্ড প্রবর্তন করা হয়নি- যা প্রতিবেশি দেশ ভারতসহ বিশ্বের বেশিরভাগ দেশই ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে। দেশে একটি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ গঠিত হলেও খাদ্যে বিষাক্ততা ও ভেজাল রোধে খাদ্যমান পরীক্ষা, প্রত্যয়ন এবং পরিবীক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা এবং সক্ষমতা সৃষ্টির যথেষ্ট উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্তি চায় বলেই দেশে নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার যোগান দিতে সারা দেশে প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নিরাপদ খাদ্য ভ্যালু- চেইন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, যা সরকার ঘোষিত "এসএমই" উন্নয়নের একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।

এমতাবস্থায়, সরকারের উচিত হবে দেশের প্রান্তিক কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কেবল বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশি-বিদেশি বৃহৎ কোম্পানির হাতে সব ছেড়ে না দিয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকের স্বার্থে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন করা এবং সে অনুযায়ী জলবায়ু সহনশীল স্থায়িত্বশীল কৃষির প্রসারে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। পাশাপাশি, খাদ্য বাজারকে সর্বসাধারণের নাগালের মধ্যে রাখতে খাদ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কর্পোরেশনের কুক্ষিগত হতে না দিয়ে ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন উদ্যোগকে প্রণোদনা দেওয়া প্রয়োজন। এর সুদূরপ্রসারী সুফল শুধু খাদ্য ব্যবস্থাতেই আসবে না, এতে ব্যাপক কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। এজন্য বর্তমান কৃষির কাঠামোগত সংস্কার অত্যাবশ্যক।

আসন্ন জাতীয় বাজেটে ক্ষুদ্র কৃষক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সুরক্ষায় ১৫ দফা সুপারিশ:

১. জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে স্থায়িত্বশীল খাদ্য উৎপাদনের স্বার্থে মাটির স্থায়িত্বশীল উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য জৈব সার ব্যবহার বৃদ্ধিসহ জলবায়ু সহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষি (Climate Resilient Sustainable Agriculture- CRSA) চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে জলবায়ুসহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষিচর্চার কৌশল ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণখাত এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ রাখা।

২. কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য চলমান উৎপাদন ও বাজার ব্যবস্থার সংস্কার করা। এজন্য কৃষকদের 'উৎপাদন ও বিপণন উদ্যোগ' গড়ে তোলা। কৃষকের শিক্ষিত তরুণদের কাজে লাগিয়ে এসএমই আকারে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে "শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প"কে পুনরুজ্জীবিত করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য 'শস্য সংরক্ষণ ঋণ' চালু করা।

৩. কৃষিপণ্যের আগাম মূল্য নির্ধারণে সরকার-উৎপাদক-ভোক্তা সমন্বয়ে মূল্য কমিশন গঠন করা। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সুদবিহীন বা স্বল্পসুদে মৌসুমভিত্তিক কৃষিঋণ সহজলভ্য করা এবং নারী কৃষকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঋণসহ সকল সরকারি সেবা ও প্রণোদনায় নারী কৃষকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত "লাঙ্গল যার জমি তার" নীতির ভিত্তিতে দেশের ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করা। এজন্য "ল্যান্ড ব্যাংকিং" ব্যবস্থা চালু করে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের কাছ থেকে জমি "ল্যান্ড ব্যাংকে" জমা

৪. https://www.tbsnews.net/economy/pesticide-use-sees-decline-316849

নিয়ে তা প্রকৃত ক্ষুদ্র কৃষক বা কৃষি উদ্যোক্তাদের জন্য সহজলভ্য করা। পাশাপাশি, ভূমি জরিপ আধুনিকীকরণ ও ডিজিটাইজেশন, ভূমি ব্যবস্থাপন-ার উন্নয়ন ও ভূমি সংস্কারে সরকারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ এবং কৃষিজমি সুরক্ষা আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৫. দেশের মৃতপ্রায় নদীগুলোকে বাঁচাতে এবং নদীর পানিভিত্তিক সেচ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রহণ করা। পাশাপাশি, নদী-নালা, খাল-বিল, হাওড়-বাওড়সহ সকল সকল জলাশয়ে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত "জাল যার জলা তার" নীতির আশু বাস্তবায়ন করা।

৬. সার, বীজ, সেচের ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল স্থায়িত্বশীল কৃষি প্রযুক্তি তথা জৈব সার, বালাইনাশক, আইপি-এম-এর মত জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশবান্ধব কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা ও ভর্তুকি প্রদান এবং এই ভর্তুকির সুবিধা যাতে সরাসরি নারী কৃষকসহ প্রকৃত কৃষকরা পায় সেটির বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। নারী কৃষি শ্রমিকদের জন্য রাষ্ট্রীয় সেবা ও অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কৃষি নীতিমালায় নারী কৃষকদের কৃষি উপকরণ ও জামানতবিহীন ঋণ প্রদান সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান রাখা।

৭. স্বাধীন ও শক্তিশালী কৃষক সংগঠন তৈরির মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রকৃত কৃষকদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮. কৃষি বাজারসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বাজারে প্রকৃত কৃষকদের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বাজারে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস ও রাস্তায় রাস্তায় চাঁদাবাজি বন্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপ প্রহণ করা।

৯. সরকারিভাবে ধান ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ডিলারের কাছে কৃষকেরা যাতে সরাসরি ধান কিংবা কৃষকদের সহযোগি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ তাদের প্রক্রিয়াকৃত চাল বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ধান বা চালের সঠিক মূল্য নির্ধারণে মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং ধানের দাম সরাসরি কৃষকের বা সহযোগি উদ্যোক্তাদের ব্যাংক একাউন্টে ট্রান্সফার করা।

১০. দেশীয় গরু-ছাগল-মহিষ- ভেড়া এবং হাঁস-মু-রগীর বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বিপণনে সরকারি সেবা ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি, বিদ্যমান পোল্ট্রি শিল্প ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় প্রণোদনা বৃদ্ধি করা।

১১. জাটকা মাছ নিধন রোধসহ সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের দুর্যোগজনিত পুনর্বাসন কর্মসুচিতে বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। ইজারাকৃত মরা নদী ও বিলের পানি শুকিয়ে মাছ আহরণের মাধ্যমে মা মাছ মারার করার প্রবণতা বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১২. বীজসহ সকল প্রকার কৃষি উপকরণের বাণিজ্য একচেটিয়াভাবে কোম্পানির হাতে ছেড়ে না দিয়ে বৃহদাংশ বিএডিসির হাতে রাখার জন্য সংস্থাটিকে আরও শক্তিশালী করা।

১৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ইকোসিস্টেমভিত্তিক অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বীজ ও কৌলিক সম্পদ সংরক্ষণে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধি করা।

১৪. মেধাপাচার রোধ করে গবেষণা কার্যক্রম আরও জোড়দার করার জন্য কৃষি গবেষণা ও কৃষি শিক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা।

১৫. যে কোনো ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগ-ব্যাধি ও পোকামাকড় কর্তৃক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য শক্তিশালী, দক্ষ ও কার্যকর 'স্যাটেলাইট-বেজড ডিজিটাল সার্ভিলেন্স ও ফোরকাস্টিং ব্যবস্থা' গড়ে তোলা এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের শস্য বীমার আওতায় আনা।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাত: প্রেক্ষিত জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩

■ আমিনুর রসুল বাবুল ও জাকির হোসেন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গত দুই দশক ধরে ৫% এর বেশি। বেশ কয়েক বছর ধরে তা ৬% শতাংশের বেশি হারে জিডিপি অর্জন করে চলছে। অপর দিকে আশংকাজনক ভাবে আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্যের চিত্র ওঠে এসেছে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ২০১০ সালে ১০% উচ্চবিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির দখলে সম্পদের মোট আয়ের ৩৫.৮০ শতাংশ ছিলো, ২০১৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৮.১৬% শতাংশে। অন্যদিকে দেশের ১০% শতাংশ দরিদ্র মানুষ ২০১৬ সালে মোট আয়ের মাত্র ১.১ শতাংশের মালিক হতে পেরেছে, যেখানে তারা ২০১০ সালে মোট আয়ের ২ শতাংশের মালিক ছিল। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে অল্প কিছু মানুষের হাতে আয় ও সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অতি ধনী লোকের সংখ্যার হার বিশ্বের সর্বোচ্চ। এদেশে ৩ কোটি ডলার বা ২৫০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১৭.৩% হারে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবংসর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানব উন্নয়নের সূচক। এ কারণে সাংবিধানিকভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে মানুষের সার্বিক সক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে। উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্য হলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সে কারণে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কেননা স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতের উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়, এটি জীবনের গুণগত মান ও সামাজিক প্রগতির ভিত্তি স্বরুপ। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নকে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হিসেবেও গণ্য করা হয়। সমাজের সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে সকল মানুষের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সবার জন্য স্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসেবে বলা হলেও এই খাতে প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়টি জাতীয় বাজেটে খুব একটা প্রধান্য পায় না। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে

দাতাদের নির্দেশিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব থাকায় স্বাস্থ্যের মতো অত্যাবশকীয় সেবাখাতগুলোতে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। ফলে সেবাখাতগুলোতে বাজেট বরাদ্দ তো বাড়ছেই না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই নিম্নগামী।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খরচ- সরকারি খরচ সর্বনিম্ন এবং ব্যক্তিপর্যায়ে খরচ সর্বোচ্চ

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে রোগীর নিজস্ব অর্থ খরচ সবচেয়ে বেশি এবং এই খরচ ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানের দেশের মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ সরকার বহন করে [১৯৯৭ সালে সরকারের অংশ ছিল ৩৭%]। বেসরকারি এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো ৩% এবং দাতা সংস্থাগুলো ৭% পর্যন্ত ব্যয় বহন করে থাকে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের মাথাপিছু স্বাস্থ্যব্যয় মাত্র ২৭ ডলার (সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত), যা ভারতে ৬১ ডলার এবং মালয়েশিয়া ৪১০ ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে জন্য এই খাতে আবশ্যিক ৪০ ডলার ব্যয় হওয়া প্রয়োজন। স্বাস্থ্যখাতে ন্যূনতম ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো: মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে তা সবচেয়ে কম, মাত্র ২৩%; যেখানে ভারতে এটি ৩৩% এবং নেপালে ৪০%। অপরদিকে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ৬৩% ব্যয় হয়, যা ভারতে ৫৭.৩% এবং নেপাল ৪৯.২%।

স্বাস্থ্য জনবলে পিছিয়ে বাংলাদেশ

জেনেভায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তরে ৭৫তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সম্মেলন শুরুর একদিন আগে স্বাস্থ্যখাতের পরিসংখ্যান নিয়ে একটি বৈশ্বিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। মূলত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টের (এসডিজি) স্বাস্থ্যখাতের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, অবকাঠামো বা আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকাই যথেষ্ট নয়। সেগুলো কার্যকরভাবে চালু রাখার জন্য পর্যাপ্ত ও দক্ষ জনবল থাকা জরুরি। এসডিজি অর্জনের জন্য তৈরি করা জনবল কৌশলপত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে, এক হাজার মানুষের সেবা দেয়ার জন্য ৪ দশমিক ৪৫ জন চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ দরকার। বাংলাদেশে এক হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসক আছেন শূন্য দশমিক ৬৭ জন। আর এক হাজার মানুষের জন্য নার্স ও মিডওয়াইফ আছেন শূন্য দশমিক ৪৯ জন। এক হাজার মানুষের জন্য চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ আছেন ১ দশমিক ১৬ জন। অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বেঁধে দেওয়া মানদন্ডের চেয়ে ৭৪ শতাংশ চিকিৎসক, নার্স ও মিডওয়াইফ কম আছে। প্রতিবেদনে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ৫১ শতাংশ মানুষ সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার সূচক অনুযায়ী সেবার আওতায় আছে। এর অর্থ দেশের ৫১ শতাংশ মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্মত সেবা পায়। এর অন্য অর্থ হচ্ছে ৪৯ শতাংশ মানুষ প্রয়োজনের সময় মানসম্মত সেবা পায় না। পাশাপাশি বলা হচ্ছে, ২৪ শতাংশ মানুষের পারিবারিক আয়ের ১০ শতাংশ চলে যায় চিকিৎসা খরচ মেটাতে। ৮ শতাংশের বেশী মানুষ পারিবারিক আয়ের ২৫ শতাংশ বেশী খরচ করে চিকিৎসার পেছনে। কয়েক বছর ধরে জনস্বাস্থ্যবিদ ও স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদেরা বলে আসছেন, চিকিৎসা ব্যয় মেটাতে দেশের অনেক পরিবার দারদ্রসীমার নিচে নেমে যাচ্ছে, অনেকে নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ মে, ২০২২)

স্বাস্থ্যসেবা খাত ও জাতীয় বাজেট

বাজেটে অর্থ বরাদ্দের চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যায়, মোট জাতীয় বাজেট বরাদ্দের তুলনায় স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দের হার বরাবরই অবহেলিত হয়ে আসছে। অথচ প্রতি অর্থ-বছরেই মোট বাজেটের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পেয়ে আসছে। জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ টাকার অংশ বাড়লেও মূল বাজেটও জিডিপি অনুপাতে বাড়েনি। গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের তুলনায়ও জিডিপি'র শতকরা হার কমেছে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসছে ২০০৯ সালে,ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯-১০ সালে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল তাতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৬.২ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.৯০ শতাংশ, আর সেখানে সর্বশেষ ২০২১-২২

বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ৫.৪৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.৯ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও মোট বাজেট ও জিডিপি'র অনুপাতে সেই পরিমাণ হতাশাব্যাঞ্জক।

স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার

স্বাস্থ্য হচ্ছে সমতা ও ন্যায়বিচারের প্রতি সামাজের অঙ্গীকারের প্রতিফলন। স্বাস্থ্য ও অন্যান্য মানবাধিকারকে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্বেগের বিষয় সমূহের ওপর জয়যুক্ত হতে হবে। স্বাস্থ্য অধিকার বাস্তবায়নে সংবিধান ও মানবাধিকার সনদ, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করতে হবে। মুনাফার উদ্দেশ্যে নয়- জনগণের স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

- **অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ:** স্বাস্থ্যের ওপর অর্থনীতির গভীর প্রভাব রয়েছে। যেসব অর্থনৈতিক নীতি সমতা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেয় যেগুলো জনস্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করতে পারে। সরকার ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা সমূহ কর্তৃক আরোপিত রাজনৈতিক, আর্থিক, কৃষি বিষয়ক ও শিল্পবিষয়ক নীতি সমূহ যেগুলি প্রধানতঃ পুঁজিবাদী চাহিদা সমূহের প্রতি সাড়া দেয় সেগুলো জনগণকে তাদের জীবন ও জীবিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ প্রক্রিয়াসমূহ অতীতে জাতিতে এবং জাতি সমূহের অভ্যন্তরে অসাম্যগুলো বাড়িয়ে তুলেছে।

- **জনকেন্দ্রীক স্বাস্থ্যখাত :** জনগণের অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য নির্বিশেষে সর্বজনীন ও সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। স্বাস্থ্যসেবাগুলো অবশ্যই গণতান্ত্রিক ও দায়বদ্ধতা হতে হবে এবং অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের ব্যবস্থা থাকতে হবে। অধিকতর গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ এবং দায়বদ্ধ নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়া সমূহের জন্য শক্তিশালী জনসংগঠন ও আন্দোলন হচ্ছে মৌলিক কাজ। এটা অপরিহার্য যে, জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সমূহ নিশ্চিত করতে হবে। একদিকে সরকারের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে স্বাস্থ্য ও মানবাধিকারের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেয়া, অন্যদিকে নাগরিক সমাজের কাজ হচ্ছে এ গুলোর বাস্তবায়নে মানটরিং নিশ্চিত করা। গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হচ্ছে সরকার নাগরিক সমাজ ও আন্দোলন গুলোর প্রচার করা।

- **কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা ও বাজেট কাঠামো :** কেন্দ্রীভূত এ প্রক্রিয়ায় সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেকোন সামাজিক, অর্থনৈতিক নীতিমালা কর্মসূচি প্রণয়নে নাগরিকদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মৌলভিত্তি। বাংলাদেশের করারোপের ভেতর দিয়ে সরকার আয় নির্ধারণ, উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, অর্থ বরাদ্দ (বাজেট) এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণের মাত্রা অত্যন্ত সীমিত বা কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। এই বিবেচনায় বিদ্যমান বাজেট প্রক্রিয়ায় মারাত্মক গণতান্ত্রিক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

কোভিড-১৯ অতিমারি

কোভিড-১৯ আতিমারি পরিস্থিতির মধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২০-২৫) বাস্তবায়ন শুরু হয়। পুরো বিশ্বের মতো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা এই মহামারির জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুরোপুরি অসচেতন ও অপ্রস্তুত ছিল। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থায় হাসপাতাল শয্যা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যসেবাদাতা, জরুরী সরঞ্জামের (পিপিই, মাস্ক, অক্সিজেন সরবরাহ) সরবরাহ নিশ্চিত করার মতো অতিপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলোয় যথাযথ প্রস্তুতির ঘাটতি স্পষ্ট হয়ে উঠে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সরকারি খাতের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬ লাখ ৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকা এবং আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি (২%)।

স্বাস্থ্যসেবা ও বেসরকারি খাত

বাংলাদেশে বিভিন্ন ইস্যুতে, বিশেষ করে দারিদ্র্য

দূরীকরণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরকারের সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার-এনজিও এই সহযোগিতার সূচনা ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ থেকে; যখন সরকার নিজস্ব কারখানায় ওআরএস উৎপাদন করেছে এবং সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানি (এসএমসি) বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করেছে (বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ ২০১২)। সরকার ও এনজিও যক্ষা, লেপরসি, এইচআইভি বা এইডস নিয়ন্ত্রণে, জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার অর্থায়নে করে ও কর্মসূচির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে এবং অংশীদারিত্বের চুক্তির আওতায় এনজিও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রকৃত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কাজ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও অন্যান্য উন্নয়ন অংশীদারের (যুক্তরাজ্য, সুইডেন, ইউএনএফপিএ) অর্থায়নে আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার প্রজেক্ট এনজিওর সঙ্গে কাজ করে নগরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রধানত এমএনসিএইচ দিয়েছে। ইউএসএইডের স্মাইলিং সান প্রজেক্ট এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত আরেকটি বড় কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর ও গ্রামীণ অঞ্চলে মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্যসেবা দেওয়াহয়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বেড়েছে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছেছে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব জোরদার করতে বাংলাদেশ সরকার বাজেট (বর্তমানে পরিচালক বাজেট) থেকে সহায়তা হিসেবে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও এনজিওকে অনুদানও দেয়। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) বাস্তবায়নের সময় হার্ট ফাউন্ডেশন, হার্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেলথ, বারডেম ও ঢাকা কমিউনিটি হসপিটালসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি (অলাভজনক) স্বাস্থ্যসেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে মানসম্মত চিকিৎসেবা দিতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল সরকার। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ও হাসপাতালের কাজ ও সংখ্যা বাড়াতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং উল্লিখিত এনজিওগুলিকে তহবিল দিয়েছিল। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫০টি সংস্থা অনুদান হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে তহবিল পেয়েছে। এসব সংস্থার মধ্যে ৯টি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বাকিগুলো এনজিও। এনজিওগুলোর জন্য অনুদান হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয় ৬৯.৫ কোটি টাকা। পাশাপশি স্বাস্থ্য ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এনজিওগুলোকে অনুদান দিয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২১৯টি সংস্থাকে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা করে মোটের ওপর ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়। এই সহায়তার পরিমাণ এতটাই কম ছিল যে এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোনো কর্মসূচি পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না। ব্যবহারকারির ফি, হেলথ কার্ডেও টাকা এবং স্বাস্থ্যবিমা, ক্ষুদ্রঋণ সহ বিভিন্নভাবে এনজিওগুলো নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ করে। এনজিওতে নিজস্ব উৎস থেকে অর্থায়ন খুবই কম মোট অর্থায়নের ২ শতাংশের কম) এবং এসব প্রতিষ্ঠান বিদেশি ও স্থানীয় দাতার মতো বৈদেশিক আন্তর্জাতিক উৎসের ওপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। ডিপিও জাতীয় এনজিওগুলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি পরিচালনায় তহবিল সরবরাহ করে। কিন্তু এসব তহবিল সরকারি বাজেটে উঠে আসে না। (সূত্র: স্বাধীনতার ৫০ বছর বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ, বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ ২০২২)

স্বাস্থ্যখাত ও সুশাসন

বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে পদার্পণ করলেও নাগরিকদের অন্যতম মৌলিক অধিকার স্বাস্থ্যসেবা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত করতে পারেনি। অদ্যাবধি হাসপাতালগুলো সঠিকভাবে চিকিৎসেবা দিতে পারছে না এবং চিকিৎসেবা পেতে গিয়ে নাগরিকদের বিভিন্ন হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। সরকারি হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি হাসপাতালগুলো থেকেও চিকিৎসেবা পেতে রোগীদের নানা ধরণের হয়রানি ও প্রতারণার শিকার হচ্ছে। তাছাড়া ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যখাতের বিদ্যমান বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং করোনো সংকটকালে স্বাস্থ্যসেবার আরো কিছু ক্ষেত্রের অব্যবস্থাপনার দিক উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি ২০৩০ অর্জনের

দিকে অগ্রসরমাণ। টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ গুণগত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে ব্যক্তির খরচ হ্রাস, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সর্বোপরি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে স্বাস্থ্যখাতে আরও অধিক বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এর স্বচ্ছ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে যথাযথ তদারকির প্রয়োজন রয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী একটি ভালো মানের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে দেশের জাতীয় বাজেটের কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বরাদ্দ হওয়া উচিত। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বাজেটে টাকার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও তা আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুপাতে নয়। বাংলাদেশের বিগত বছরগুলোর স্বাস্থ্যখাতের বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, এটি জাতীয় বাজেটের ৬ শতাংশের বেশি নয়। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে যেখানে বরাদ্দ ছিল ৬ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের ৬.১৩ শতাংশ, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি করে ২৯ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হলেও তা জাতীয় বাজেটের ৫.১৫ শতাংশ।

ইতিবাচক দিক

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ২০০০ সালে ছিল ৬৫.৩ বছর যা বর্তমানে ৭২.০০ বছরে উন্নীত হয়েছে।

- পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা পেয়ে থাকে ৭৩%; শিশুদের টিকা প্রদানের অর্জন ৯৭%; অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে ৬৫% মানুষকে।

- মাতৃমৃত্যু হার ২০১৮ সালে প্রতি এক লাখে ১৭২ জন, যা ২০১৫ সালে ছিল ১৮১ জন; প্রতি ১ হাজারে নবজাতকের মৃত্যু ২০১৫ সালে ছিল ২০, যা ২০১৮ সালে কমে হয় ১৭ জন।

- ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জনের ২০০০ সালে ছিল ৮৮ জন, যা ২০১৬ সালে ৩০ জনে নেমে এসেছে।

- সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে।

- সরকারি স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হলেও সাম্প্রতিক সময়ের এক গবেষণা অনুযায়ী দেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য ৬৪% খরচই পকেট হতে বহন করতে হয়।

উল্লেখিত ভালো নির্ণায়কগুলো আরো উন্নত করার জন্য সুনির্দিষ্ট বাজেট বরাদ্দ ও স্বাস্থ্যখাতে দূর্নীতি কমানোর কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

সুপারিশ/ প্রস্তাবনা

নিম্নলিখিত সুপারিশমালার আলোকে স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দের কাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে-

১. বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে হবে। জেলা পর্যায়ের সমন্বয় ও স্থানীয় চাহিদার আলোকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের অসমতা দূর করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা ও প্রয়োজনেরভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।

২. জনগণের ক্রয় ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং তাদের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। ব্যক্তির বর্ণ, সামাজিক পটভূমি, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিভা শ্রেণী ভেদাভেদ না করে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা লাভের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

৩. ১৯৭৮ সালের আলমা আতা ঘোষণার প্রতিফলন- প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সর্বজনীন ও ব্যাপকভিত্তিক নিয়মনীতি সমূহ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নীতিসমূহের ভিত্তিমূল হওয়া উচিত। স্বাস্থ্যসেবায় আরো অধিক সমতাপূর্ণ, অংশগ্রহণমূলক এবং বহুমাত্রিক এপ্রোচ প্রয়োজন।

৪. সকল অর্থনৈতিক নীতিতে স্বাস্থ্য সমতা, জেন্ডার এবং পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণের ওপর নির্ভর করে তৈরি করতে হবে। স্বাস্থ্য সমস্যাগুলিকে সমাধানের পন্থা হিসেবে সমন্বিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও জনস্বাস্থ্য সেবা প্রবর্তন করতে হবে। যাতে বিনা খরচে সর্বজনীন সুযোগ নিশ্চিত হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে ও সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যয়ের অসমতা দূর করতে হবে।

৫. জাতীয় নীতি সমূহের যেগুলো স্বাস্থ্যসেবাকে ব্যক্তি মালিকানাধীন করে এবং স্বাস্থ্যসেবাকে পণ্যে পরিণত করে তা বন্ধ করতে হবে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য ও ঔষধ নীতি গ্রহণ বাস্তবায়ন কার্যকর করতে হবে।

৬. স্বাস্থখাতে সকল শূণ্যপদ অনতিবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রত্যন্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার দিকে সরকারের নজর দিতে হবে। চরাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় "রিভার এম্বুলেন্স" প্রদান করতে হবে।

৭. স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণের পরিবর্তন আনার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে করে তা যেন অধিকতর সমস্যা কেন্দ্রীক এবং প্রয়োগভিত্তিক হয়। একই সাথে তারা যেন সমাজের ইস্যুগুলো বুঝতে পারে এবং সমাজের জন্য কাজ করতে উৎসাহ বোধ করে।

৮. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে এবং সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে বাস্তবসম্মত পথ নির্দেশিকা ঘোষণা করা এবং সকলের জন্য সরকারি ভাবে সর্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা নিশ্চিত করতে হবে। সেইসাথে অসংক্রামক রোগের সচেতনতামূলক প্রচার-প্রচারণার জন্য তৃণমূল থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিটি হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সচল ও নিয়মিত করতে হবে এবং চিকিৎসকদের নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এর সাথে সাথে স্বাস্থ্যখাতে সকল প্রকার অপচয়, অব্যবস্থাপনা ও দূর্নীতি দূর করতে হবে। ওষুধ শিল্পের মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১০. সারাদেশে দক্ষ চিকিৎকের সুষম বন্টন এবং অধিক সংখ্যক নার্স তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে লোকবল এবং ঔষধের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. জনবাজেট প্রতিবেদন: জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০ বৈষম্য কমাতে জাতীয় বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশনা চাই
২. বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবাখাত ও জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০, আমিনুর রসুল বাবুল ও জাকির হোসেন
৩. বাজেটের সংক্ষিপ্ত সার অর্থ মন্ত্রণালয় (২০২১-২২)
৪. স্বাধীনতার ৫০ বছর বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের বিকাশ, বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ ২০২২

মানসম্মত শিক্ষার জন্য প্রয়োজন অধিক বরাদ্দ এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা

■ জি এম রাকিবুল ইসলাম

জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষার পরিমাণগত উন্নয়নের দিকে গুরুত্ব দিয়ে এবারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে সকলের জন্য মানসম্মত জীবনব্যাপী শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটির ওপর এসডিজির অবশিষ্ট ১৬টি লক্ষ্যমাত্রার অর্জন নির্ভরশীল। তাই টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন উদ্যোগ ও অর্জন বিশ্বের দরবারে প্রশংসা কুড়িয়েছে। এরমধ্যে শিক্ষায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি হার, বিনামূল্যে বই বিতরণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পরিমাণগত অর্জন শেষে এখন শিক্ষার গুণগত উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান শিক্ষানীতির লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে। শিক্ষায় রাষ্ট্রীয় অর্থের যোগানকে খরচ হিসেবে না দেখে বিনিয়োগ হিসেবে দেখতে হবে এবং জিডিপির একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ শিক্ষায় বরাদ্দ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, গড়ে যদি ১ বছর অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় তবে ব্যক্তি পর্যায়ে ১০% উপার্জন বৃদ্ধি পায় এবং তা জাতীয় পর্যায়ে জিডিপি ১৮% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।[১]

'এডুকেশান ২০৩০ ফ্রেমওয়ার্ক ফর একশান' অনুসারে কোনো দেশের জিডিপির ৪ থেকে ৬% অথবা মোট বাজেটের ১৫ থেকে ২০% শিক্ষায় বিনিয়োগ করা উচিত[২]। জিডিপির ৬% হিসাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের শিক্ষা বাজেট হওয়া উচিৎ ছিল প্রায় ২৮ বিলিয়ন ডলার বা ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৭০ কোটি টাকা (বিবিএসের তথ্য অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপির পরিমাণ ৪৬৭ বিলিয়ন ডলার)। কিন্তু প্রকৃত বরাদ্দ ছিল ৭১ হাজার ৯৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপির ২% এর কাছাকাছি। বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ যে কম এটা আমাদের নীতিনির্ধারকেরা জানেন এবং বোঝেন। সে কারণে

১. https://blogs.unicef.org/blog/education-the-most-powerful-investment-in-our-future/
২. https://www.education-progress.org/en/articles/finance

প্রতিবছর শিক্ষার সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাত যুক্ত করে বাজেটের আকার স্ফীত করে উপস্থাপন করেন। যেমন- ২০২১-২২ অর্থবছরে শিক্ষায় মূল বরাদ্দ ছিল প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা যা মূল বাজেটের ১১.৯২%। কিন্তু এর সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অতিরিক্ত প্রায় ২৩ হাজার কোটি টাকা যোগ করে মূল বাজেটের প্রায় ১৬% দেখানো হয়েছে। (তথ্যসূত্র: বিভিন্ন অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত)।

বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ ফিবছর কমছে এই খবর এখন কমবেশি সকলেরই গা-সওয়া হয়ে গেছে। অন্যদিকে এ কথাও সত্য যে এই বরাদ্দকৃত অর্থ সব সময় সঠিক-ভাবে ব্যয় হচ্ছে না। অর্থাৎ শিক্ষায় অব্যবস্থাপনার বিষয়টি মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে একটি বড় বাধা। এই অব্যবস্থাপনা একদিকে যেমন শিক্ষায় অপচয় বাড়ায় তেমনি অন্যদিকে সমাজে অসমতা তৈরি করছে। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত না হলে সকলেরই শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে শিক্ষায় পারিবারিক কিংবা ব্যক্তিগত ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আর্থসামাজিকভাবে এগিয়ে থাকা মানুষজন নিজখরচে প্রাইভেট টিউশনের ব্যবস্থা করে নিজেদের সন্তানের শিক্ষা কোনো মতে এগিয়ে নিতে পারলেও প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্র মানুষ জন ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছে। ফলে সমাজে অসমতা বাড়ছে। তাই যে কোন খাতে উন্নয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ হলো তার সাথে সাথে সেই টাকা কোন উপায়ে খরচ করা হলো সেটা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের অনেক দেশই শিক্ষায় বরাদ্দ বেশি (যেমন: যুক্তরাষ্ট্র) করলেও অব্যবস্থাপনার কারণে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল লাভ করতে পারে না। আবার অনেক দেশই তুলনামূলক কম বরাদ্দ নিয়ে (যেমন: ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান) দক্ষতার সাথে খরচ করে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। তাই বরাদ্দ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন স্তর এবং মাধ্যম রয়েছে, সেগুলোর সাথে সাথে জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্ষেত্র পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বিবেচনা করে একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাজেটে নির্দিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। বিগত অর্থ বছরের বাজেটের সাথে নতুন কিছু কম্পোনেন্ট জুড়ে দিয়ে বাজেট বৃদ্ধির যে চর্চা এটি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে কোনভাবেই সহায়ক নয়। চাহিদা ও প্রয়োজনকে বিবেচনায় নিয়ে অগ্রাধিকারভি-ত্তিতে যে অঞ্চলে যে রকম প্রয়োজন সে অনুযায়ী বাজেটে বরাদ্দের ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষা হিসেবে প্রাক- প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ এটিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপশি শিক্ষক নিয়োগ করেছে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু সেই অর্থে প্রাথমিক শিক্ষায় বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে-ন। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মাত্র ৩৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের জন্য পিটিআইগুলো জনবল সংকটের কারণে মানসম্মত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হিমশিম খাচ্ছে। আবার করোনার কারণে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, সেই সময় সরকারের উদ্যোগে টেলিভিশন, রেডিও ও মোবাইলে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল ডিভাইস না থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ শিখন ক্ষতির/ ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার ২০২১-২২ অর্থবছরে কোভিড-১৯ স্কুল সেক্টর রেসপন্স প্রকল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু তার ফলাফল এখনও দৃশ্যমান হয়নি। গত বছর ইউনেস্কো এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, কোভিড ১৯-এর ফলে পারিবারিক অর্থ সংকট, শিশুশ্রম, বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, ঝরেপড়া, অপুষ্টিজনিত প্রতিবন্ধকতা ও বাল্যবিবাহের কারণে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাখাতে বিগত দুই দশকে যে অগ্রগতি হয়েছে তা বড় ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে বলে যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল তা এখনও বলবৎ। এ থেকে উত্তরণের জন্য প্রান্তিক জনগে-ষ্ঠীর চাহিদা এবং অধিকারের কথা বিবেচনা করে মানবসম্পদ উন্নয়নের অন্যতম ভিত্তি হিসেবে শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সেই সাথে নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সু-বিধা নিশ্চিত করার পাশাপশি শিক্ষকদের সক্ষমতা

বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতি বছর গড়ে প্রায় ২০ লাখ মানুষ (বেশিরভাগই তরুন) শ্রমবাজারে প্রবেশ করে, যাদের চার ভাগের মাত্র এক ভাগ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত[৩]। ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে লাখ লাখ কর্মোপযোগী মানুষ শ্রমবাজারের বাইরে অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করছে। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে এরাই দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হতে পারে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করতে চায়- যা দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ছাড়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর ভিশনে স্পষ্টত: বলা হয়েছে যে "জাতীয় উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে সরকার এবং শিল্প স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে"।[৪] ফলে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থেই জনমিতির সুবিধাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে আমাদের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। সে কারণেই কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

একইসাথে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গত অর্থবছরের বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি। ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগকে ৯ হাজার ১৫৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যার বেশিরভাগ শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানে ব্যয় হয়। কোভিড-১৯ অতিমারির ফলে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়ার হার, আয়-সৃজনি কর্মে যুক্ত হওয়া এবং বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে শিক্ষার্থীদের একটা বড় অংশ শিক্ষায় ফিরে না আসার ঝুঁকিতে রয়েছে। তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করে শিক্ষায় ফিরিয়ে আনা জরুরি। একইসাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর না হলে মানসম্মত শিক্ষা অর্জন সম্ভব হবে না।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় বরাদ্দও গতানুগতিক ধারা রক্ষা করে চলেছে এবং এর ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। বৈশ্বিক জ্ঞান সূচক ২০২১ অনুসারে ১৫৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২০তম[৫]। আমাদের অবস্থান আমাদের প্রতিবেশী দেশ নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান, ভারত এমনকি পাকিস্তানেরও নিচে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মেলাতে এবং জনমিতির সুবিধা কাজে লাগাতে হলে আমাদের যুবসমাজকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। সেজন্য শিক্ষায় প্রযুক্তির সন্নিবেশ এবং জ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় আমাদের দক্ষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপশি গবেষণায় বরাদ্দ বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছে প্রায় এক যুগ হতে চলল। কোভিড-১৯ আমাদেরকে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করেছে। সাম্প্রতিককালে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়নের পাশাপশি বিদ্যমান শিক্ষানীতির পরিমার্জন এবং শিখন ঘাটতি পূরণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা বাজেটের ধারাবাহিকতায় যদি এভাবেই বরাদ্দ দেওয়া হতে থাকে তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে এসকল উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে শিক্ষাকে যেভাবে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, ভবিষ্যতের টেকসই উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বর্তমান সরকারকেও করোনা বিপর্যয় থেকে শিক্ষা উদ্ধারের পদক্ষেপ গ্রহণ

---

৩. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-dhaka/documents/publication/wcms_735704.pdf
৪. https://nsda.portal.gov.bd/sites/default/files/files/nsda.portal.gov.bd/page/79fe610e_04d6_4409_8331_1578b9a0e1d1/2020-02-27-12-48-ce8417d61160ddc250a73871596650df.pdf
৫. https://www.tbsnews.net/bangladesh/knowledge-index-rd-tugs-down-bangladesh-below-global-average-343768

করতে হবে এবং তার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বাড়াতে হবে। একইসাথে বরাদ্দকৃত অর্থ যেন যথাযথভাবে ব্যয়িত হয় সেদিকে নজর দিতে হবে।

প্রস্তাবনা

১. বাজেটে বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। বিদ্যমান শিক্ষানীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা, নতুন শিক্ষাক্রম এবং অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য ধাপে ধাপে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে শিক্ষাকে একটি একক খাত হিসাবে বিবেচনা করে মোট বাজেটের ১৫-২০% বরাদ্দ দিতে হবে।

২. কোভিড-১৯ এর ফলে সৃষ্ট শিখন ঘাটতি পূরণ, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সৃষ্ট ডিজিটাল বৈষম্য নিরসন এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য শিক্ষার্থী-দের জন্য ডিজিটাল উপকরণের ব্যবস্থা করার পাশাপশি শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিনা সুদে শিক্ষাঋণ চালু করতে হবে।

৩. ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুফল পেতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপশি নতুন নতুন শিক্ষা প্রযুক্তির সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুসজ্জিত করতে হবে। এজন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে। একইসাথে যুগোপযে-াগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিদ্যমান শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৪. ২১শ শতকের চাহিদা বিবেচনায় শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষকদের জন্য চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। নিয়োগ পদ্ধতি সংস্কার এবং যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন করতে হবে।

৫. শিক্ষার সকল স্তরে একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল শিশুর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যমান অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ এবং শিখন পরিবেশ প্রতিবন্ধীবান্ধব করতে হবে।

৬. বিজ্ঞান, গণিত, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার সম্প্রস-ারণের লক্ষ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংলগ্ন ডিজিটাল লাইব্রেরি, আইসিটি ল্যাব, ভাষা শিক্ষা ল্যাব, বিজ্ঞানাগার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি স্থাপনা নির্মাণ করতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ দিতে হবে।

৭. ৪র্থ শিল্প বিপ্লব এবং জনমিতির সুবিধা কাজে লাগাতে হলে আমাদের যুবদেরকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তুলতে হবে। সেজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আধুনি-কীকরণ করতে হবে এবং দক্ষ প্রশিক্ষক ও হাতেক-লমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একইস-াথে উচ্চ শিক্ষায় প্রযুক্তির সন্নিবেশ, বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির জন্য বিশ্বের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে গবেষণাকার্য পরিচালনার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষায় গবেষণা বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. সকল অঞ্চলের জন্য একই রকম বাজেট প্রণয়ন না করে বিভিন্ন অঞ্চল এবং লক্ষ্যদলের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ করে ভৌগলিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারী, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নগরীর বস্তিতে বসবাসকারী জনগণের জন্য ন্যায্যতার ভিত্তিতে বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে। কেননা সুযোগের অসমতা এসকল জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় যুক্ত করতে সক্ষম হয় না।

৯. সর্বোপরি বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় মানুষজনের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।

বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার হিসাবে দলিত মানুষের সংখ্যা অর্ধ কোটির কাছাকাছি। কেবল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জেই পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে পরিচিতদেরই ২৭টি কলোনি আছে। এর বাইরেও দেশের প্রতি জেলায় রবিদাস, ঋষিসহ বহু সম্প্রদায় রয়েছে।

পরিচ্ছন্নকর্মী, চা-শ্রমিকসহ দলিত জনগোষ্ঠীর বাজেট ভাবনা

■ আলতাফ পারভেজ

দলিতদের মাঝে বহু জাতিগোষ্ঠীর মানুষ থাকলেও পেশাগত বিবেচনায় তাঁরা তিন ধরনের। একদল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করেন। আরেক দল চা শ্রমিক। অপর একটি গোষ্ঠী বেঁচে থাকার সংগ্রামে গ্রাম-শহর মিলে অপ্রাতিষ্ঠানিক নানান কাজে যুক্ত। এই সকল দলিত মানুষরা বাংলাদেশের অর্থনীতির এমন এক বর্গ যাঁরা বাজেটে বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বিশাল জনগোষ্ঠী হলেও এদের বিষয় দেখার জন্য বাংলাদেশে আলাদা কোন মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই। ফলে বাজেটের মোটাদাগের বরাদ্দে তারা থাকেন অনুপস্থিত। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে এই জনগোষ্ঠির জন্য এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের আলোচিত বরাদ্দ মূলত দুটি। একটি- দলিতদের সাথে হরিজন, বেদে ও হিজড়াদের মিলিয়ে সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্প। অন্যটি- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশনের অধীনে তাদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ কর্মসূচি। ২০১১-১২ সালে বাসগৃহ নির্মাণ খাতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যদিয়ে শেষোক্ত কাজ শুরু হয়েছিল এবং পরে তা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে, বরাদ্দও বেড়েছে। তাতে দলিত, অদলিত সকল পরিচ্ছন্নতাকর্মীরাই যুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে ২০১২-১৩ তে প্রাথমিকভাবে সাতটি জেলায় দলিত, বেদে, হরিজন ও হিজড়াদের নামে যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আরম্ভ হয়-বর্তমানে সেটি ৬৪ জেলাতেই বাস্তবায়িত হচ্ছে- তবে 'অনগ্রসর' বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আওতায়। ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল এরূপ 'অনগ্রসর'দের জন্য। এই ক্ষেত্রে সমস্যা হলো, দলিতদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে যখনই কোনো প্রকল্প তৈরি হয় সেটি ক্রমে 'অনগ্রসর' সকলের জন্য হয়ে যাওয়ার মধ্যদিয়ে দলিতদের সংকটের সুরাহা আর হয় না। অথচ বাজেটে তাদের জন্য আলাদাভাবে আর্থিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিপাত থাকা প্রয়োজন। ২০১৬ থেকে ২০২০ পর্যন্ত বাজেটগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই 'অনগ্রসর' শব্দের আড়ালে দলিতরা হারিয়ে গেছে। ফলে তাদের জন্য পৃথক বরাদ্দের

বিষয়ও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। তাই, বিগত কয়েকটি বাজেটে চা শ্রমিকদের জন্য যেভাবে পৃথকভাবে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল সেভাবেই দলিতরা আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচি চাইছে।

দলিত কর্মীদের জন্য জেলায় জেলায় আবাসন দরকার

দলিতদের বড় অংশের প্রধান সমস্যা বাসস্থান। সম্প্রতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বরিশালে দলিতদের একাংশ– পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য উন্নত বাসস্থান তৈরির প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। এরকম উদ্যোগ দেশের দলিত–শ্রমজীবী সকলের জন্য সকল জেলায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ক অনুসন্ধানকালে ৬০ ভাগ দলিত জানিয়েছেন তারা যেখানে বাস করে সেই জায়গার মালিক তারা নন। এর মাঝে ৫৫ ভাগ জানিয়েছেন, তারা সবসময় উচ্ছেদ আতঙ্কে থাকেন। যেখানে উচ্ছেদ আতঙ্ক নেই সেখানেও তাদেরকে বহু আগের খুপরিতেই থাকতে হচ্ছে–পরিবারের সদস্যদের একসাথে। চা বাগানে দেখা যায়, ছোট ছোট ঘরে শ্রমিক পরিবারগুলো থাকে– কিন্তু জায়গা থাকার পরও বাড়তি ঘর তোলার অনুমতি মেলে না সহজে। নেই পুরানো ঘরের সংস্কারের নিশ্চয়তা। এ অবস্থা থেকে বাঁচাতে দলিতদের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করে সেগুলো স্থায়ীভাবে তাদের নামে বরাদ্দ দেয়ার সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য যেসব ভবন তৈরি করছে সেখানে আপাতত চাকুরি নেই এমন দলিতদেরও থাকার অনুমতি দিতে হবে।

দলিত শ্রমিকদের পেশাগত সুরক্ষা সামগ্রী দিতে হবে

দেশের অন্যান্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যার পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা কর্মী, চা শ্রমিক কিংবা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দলিতকর্মীদের প্রতিনিয়ত বাড়তি কিছু স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে হয়। কম মজুরি ও মর্যাদাহীন জীবনের কারণে তারা এমন অনেক কাজ করতে বাধ্য হয় যেগুলোতে পেশাগত ঝুঁকি অনেক বেশি থাকে। অনেক সময় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা উপকরণ মাস্ক, দস্তানা, গামবুট ইত্যাদি ছাড়া খালি হাতে কাজ করতে হয় পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের। এতে করে তারা চর্মরোগ, শ্বাসনালীর সমস্যা, পিঠের সমস্যা ইত্যাদিতে ভোগেন। অথচ সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে শ্রমিকদের সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়ার নীতিমালা রয়েছে। দলিত শ্রমিকদের অন্যতম জনগোষ্ঠী চা শ্রমিকরা অনেকে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে কাজ করেন। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা উপকরণ ছাড়া বাগানে কীটনাশক দিতে হয় অনেককে। এতেও পেশাগত স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ে তারা। অনুসন্ধানকালে দলিতদের ৫৪ শতাংশ বলেছে , তাদের কাছাকাছি এলাকায় কোনো সরকারি হাসপাতাল নেই। আবার ২১ শতাংশ দলিত জানিয়েছেন, হাসপাতালে তারা সেবা নিতে গেলে বৈষম্যে শিকার হন। তাদের জাতপাত ও পেশাগত পরিচয় এই বৈষম্যের বড় একটি কারণ। দলিতদের পেশাগত নিরাপত্তা বাড়াতে পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদগুলোর মাধ্যমে তাদের কাছে পেশাগত সুরক্ষা উপকরণ সরবরাহ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়া দলিতদের জন্য জরুরিভিত্তিতে তাদের কমিউনিটিতে বিশেষায়িত হাসপাতাল দরকার। চা বাগানের বিদ্যমান হাসপাতালগুলোতে চাহিদা মতো ডাক্তার, নার্স ও ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।

সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত কোটা বাস্তবায়ন করতে হবে

দলিতদের মাঝে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন যতটা বাড়ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় তাদের অভিগম্যতা সে হারে বাড়ছে না। এ অবস্থা বদলাতে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য ১ শতাংশ কোটার যে চর্চা শুরু হয়েছে সেটি যাতে সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্বপ্রণোদিতভাবে অনুসরণ করে সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রয়োজন। কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নেই এমন অজুহাতে দলিত অভিভাবকরা কন্যাদের কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে চাইছে না। এই চক্র ভাঙ্গাতে সাময়িক সময়ের জন্য সকল দলিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা–প্রণোদনা বৃত্তি প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়া চা বাগান শ্রমিকদের নিয়োগদাতা কোম্পানিগুলোকে এবং পরিচ্ছন্নকর্মীদের নিয়োগদাতা হিসেবে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনগুলোকে দলিত শিশুদের শিক্ষাবৃত্তি দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। চা বাগানের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে (প্রায় ১৭০টি) গুণগতভাবে পাঠদান হচ্ছে কি না বা হওয়ার মতো পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামো আছে কি না সে বিষয়ে শ্রম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ নজরদারি এখন সময়ের

দাবি। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অন্যান্য জেলায় দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির যে ব্যবস্থা আছে তাতে বরাদ্দ খুব অপ্রতুল। সেটা বাড়ানো দরকার। জাতীয় শিক্ষা বাজেটে দলিতদের শিক্ষা উন্নয়ন ফোকাস করে বিশেষায়িত প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

দলিতদের বসবাস এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে

শহর-গ্রাম সর্বত্র দলিত কলোনিগুলোতে বড় এক সমস্যা বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতা এবং স্যানিটেশন সুবিধা-র অপর্যাপ্ততা। ২০১৫ সালে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ঢাকার দলিত কলোনিগুলোতে পানির এক-একটি উৎস ব্যবহার করছে সর্বনিম্ন ১২ থেকে সর্বোচ্চ ৬০০ জন মানুষ। নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকার কিছু কলোনিতে এখন এই সমস্যার তীব্রতা কমেছে। যারা ভবনে বরাদ্দ পাচ্ছে তাদের রুমের সঙ্গে পানির উৎস থাকছে। গণকটুলি, ধলপুর, গাবতলী ও ওয়ারিতে এরকম নতুন ভবন হলেও ঢাকার অন্যান্য কলোনিতে এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বাইরের দলিত পাড়াগুলোতে পূর্বের মতো পানির সংকট চলছে। জাতীয় মানদন্ডে জনপ্রতি ন্যূনতম ২০ লিটার পানি এবং প্রতি পরিবার বা সর্বোচ্চ দুটি পরিবারের জন্য একটা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ঘরের ব্যবস্থার লক্ষ্য রয়েছে। দলিতদের জন্য এরকম ব্যবস্থা করতে এখনি বাজেট বরাদ্দ দিয়ে বিশেষ প্রকল্প নেয়া প্রয়োজন। চা বাগানের শ্রমিক কলোনিগুলোও পানির সংকটে রয়েছে। সেখানে কুয়া, ছড়া, খাল ইত্যাদির নোংরা পানি ব্যবহার করে বাসিন্দারা। গ্রীষ্মে টিউবয়েলগুলোতে পানি উঠে না। টিউবয়েল সংখ্যাও অপ্রতুল। কুয়াগুলোও তখন শুকিয়ে যায়। ২০ শতাংশ শ্রমিক সেখানে খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। চা শিল্পের মতো লাভজনক শিল্পখাতে শ্রমিকদের এরকম জীবনযাপন মেনে নেয়া যায় না।

দলিত পরিবারগুলোর জন্য বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দরকার

যে হারে দেশের মূলধারার সমাজে দারিদ্র্য কমছে সেভাবে দলিত শ্রমজীবী পরিবারের কমছে না। চা খাতের মতো পুরানো শিল্পে এখনও ৬১ শতাংশ মানুষ দরিদ্র এবং ৪২ হতদরিদ্র। যেখানে কৃষিখাতে শ্রমিকদের গড় মজুরি প্রায় ৫ শ টাকা- সেখানে চা শ্রমিকরা কিছু রেশনসহ দিনে ১২০ টাকা পেয়ে থাকে। জাতীয় উন্নয়ন ধারার এরকম ভারসাম্যহীনতা কমাতে দলিত শ্রমজীবীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আকারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এই রকম কর্মসূচির কিছু পদক্ষেপ পূর্বে দু'এক বছরের বাজেটে রয়েছে। ২০১৩-১৪ সালের বাজেটে দলিত, বেদে ও হিজড়াদের জন্য শুরু হওয়া বরাদ্দ এবং তার দু'বছর আগে শুরু হওয়া দলিত আবাসন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এখন সময় এসেছে দেশের সকল দলিতের জন্য বড় আকারে সামাজিক নিরাপত্তা বাজেট গ্রহণ করার। সরকার জানিয়েছে ২০২৫ সালের মধ্যে সকল হতদরিদ্রকে কোনো না কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দলিত জনগোষ্ঠীর সকল ধারাকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা এখন সময়ের দাবি। ইতোপূর্বে দলিতদের জন্য শুরু হওয়া অনেক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি দ্রুত 'অনগ্রসর শ্রেণী'র জন্য রূপান্তর করে সেসব কর্মসূচির বড় অংশই অ-দলিতদের দিয়ে দেয়া হচ্ছে। সেগুলো আবার শুধু 'দলিত'দের জন্য সুনির্দিষ্ট করা দরকার।চা বাগানে 'বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' হিসেবে চার ভাগের এক ভাগ শ্রমিককে ৫ হাজার টাকা করে যে এককালীন ভাতা দেয়া হয় তাতে অস্থায়ী শ্রমিকদেরও যুক্ত করা প্রয়োজন। এ কর্মসূচির বরাদ্দও বর্তমানের ২৫ কোটি টাকা থেকে বাড়াতে হবে।

খাসজমি বরাদ্দে দলিতদের অগ্রাধিকার দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে

বাংলাদেশে দলিত সমাজের একটা বড় অংশ উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকা থেকে এ অঞ্চলে আসা মানুষ। তাদের থাকার স্থায়ী জমি নেই। চিরস্থায়ী এই ভূমিহীনতা এই জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের বড় কারণ। মালিকানাধীন ঘর বা জমি না থাকলে এদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বা নাগরিক সুবিধা পেতে সমস্যা হয়। অথচ বিদ্যমান খাসজমি বিতরণ ব্যবস্থায় তারা অগ্রাধিকার পাওয়ার দাবিদার। বাংলাদেশে খাসজমি বিতরণের জন্য সরকারের যে কয়টি প্রধান নীতি আছে তা ভূমিহীন দরিদ্রদের খাসজমি দেয়া অনুমোদন দেয়। ফলে খাসজমি বিতরণে দরিদ্র দলিতদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং

অগ্রাধিকার দেয়ার বিষয় এখনি ভাবা দরকার। একই-ভাবে সরকারের বহুল আলোচিত একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পেও দলিতদের অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো দরকার- যদিও এতদিন কৃষিবহির্ভূত পেশাজীবী হিসেবে তাদের এসবে কমই সুবিধা দেয়া হয়েছে।

শহুরে দলিত পেশাজীবীদের কাজের জন্য ছাউনি বানিয়ে দিতে হবে

বসবাসের জন্য খাসজমি বরাদ্দের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে যেসব দলিত মুচির কাজ করে তারা যুগের পর যুগ এই কাজে থাকলেও নিশ্চিন্তে বসে কাজের জায়গা নেই। রাস্তার ধারে সার্বক্ষণিক উচ্ছেদ আতঙ্কে কাজ করতে হয়। তাই তাদের কাজের জন্য সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন শহরে সরকারি জায়গায় ছোট আয়তনে ছাউনি নির্মাণ করে দেয়া হলে এদের কর্মসংস্থানের সমস্যা কিছুটা মিটবে।

জাত-পাতভিত্তিক বৈষম্যকে অপরাধ সাব্যস্ত করে আইন করতে হবে

বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন করা বর্তমান সময়ে দলিতদের একটা বড় দাবি। দলিতরা মনে করছে এই দাবির বাস্তবায়ন অন্যান্য সকল সমস্যার সমাধানে অভিভাবকতুল্য ভূমিকা রাখবে। ২০১৪ থেকে দেশে এরকম একটা আইনের খসড়া সংশোধন ও পরিমার্জন চলছে। সর্বশেষ ২০২২ সালের ৫ এপ্রিল এই খসড়া বিল আকারে জাতীয় সংসদেও পেশ হয়েছে। সংসদীয় একটি কমিটি বর্তমানে এই বিলের পর্যালোচনা করছে। দলিত সমাজের দাবি সম্ভাব্য এই আইনে জাতপাত জনিত বৈষম্যকে 'অপরাধ' হিসেবে সার্ব্যস্ত করে শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হোক।

শহরে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও হোস্টেল প্রয়োজন

দলিতদের মাঝে বেকারত্বের হার প্রবল। ঐতিহাসিক-ভাবে দলিতরা যেসব পেশায় যুক্ত হতো সেসব জাতি-ভিত্তিক কাজে ইতোমধ্যে অ-দলিতরা বড় সংখ্যায় হাজির হয়ে গেছে। আবার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার যুগে ঋষিসহ অনেক পেশাজীবী জনগোষ্ঠী তাদের পুরানো কাজের জায়গা হারাচ্ছে। সমাজে জাতিগত অস্পৃশ্যতার রেশ থাকায় শিক্ষিত হয়েও অনেক দলিত অফিস-আদালতে সম্মানজনক চাকুরি পান না। এরকম বাস্তবতায়, জাতীয় সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদের আলোকে দলিত তরুণ-তরুণীদের জন্য সকল নিয়োগে ন্যূনতম কিছু কোটা প্রয়োজন। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমখাতে দলিতদের স্ব-কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। সরকারের যুব প্রশিক্ষণে দলিতদের অভিগম্যতা বাড়ানো দরকার। সেলাই, ড্রাইভিং, মোবাইল টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সম্পূর্ণরূপে দলিতকেন্দ্রীক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার বাজেট-সিদ্ধান্ত দরকার। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পাশাপাশি এরকম প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য রাজধানীসহ বড় কিছু শহরে কর্মজীবী হোস্টেল প্রয়োজন। কেবল হোস্টেলের অভাবে বহু দলিত শহরে কাজ পেয়েও টিকতে পারছে না। একই সমস্যা দলিত শিক্ষার্থীদের। কিছু হোস্টেল নির্মাণ করে এরকম সংকটের সমাধান করা যেতে পারে।

দলিতদের ভাষা ও সাংস্কৃতিকক একাডেমি গড়ে তোলা

দেশে সংখ্যালঘু কয়েকটি নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক চর্চার জন্য কয়েকটি ইনস্টিটিউট রয়েছে। আদিবাসীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটগুলোর মতো দলিতদের ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন। শিল্পকলা একাডেমিকেও দলিত সংস্কৃতিমুখী প্রকল্প গ্রহণ করতে বাজেট নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। এরকম উদ্যোগ বাংলাদেশের সংস্কৃতি ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক বাজেট প্রত্যাশা

■ আলবার্ট মোল্লা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থা

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নির্ভরযোগ্য কোন পরিসংখ্যান নেই। অথচ পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করেই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। আবার বিভিন্ন উৎস থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতেও অনেক অসামঞ্জস্য রয়েছে। যেমন- জনশুমারি ২০১১-তে মোট জনসংখ্যার ১.৪১ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ অনুযায়ী ৯.০৭ শতাংশ, খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬- তে ৬.৯৪ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপে সর্বমোট ২৫ লাখ ২০ হাজার ২১২ জন (০২ এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)।

২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রতিবছর যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতু-ল। যেমন ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি খাতে বাজেটের মাত্র ২.০৭% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিলো, যা মোট বাজেটের মাত্র ০.৩৭%।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিষয়ে দেশে শক্তিশালী আইনী কাঠামো রয়েছে। কিন্তু সেটি বাস্তবায়নে বাজেটে দৃশ্যমান কোনো প্রতিফলন থাকছে না।

৪. জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামতের প্রতিফলন ও কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না।

৫. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়।

৬. প্রবেশগম্যতা, অসচেতনতা, বৈষম্য ইত্যাদির কারণে মানব উন্নয়নের মৌলিক সেবায় যেমন- শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের রীতিবদ্ধভাবে অন্তর্ভুক্তি হচ্ছে না।

প্রস্তাবনা

জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। এজন্য গতানুগতিক ধারায় কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে সামাজিক মডেল বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা থেকে যে আলাদা তা বিবেচনায় আনতে হবে। এইসব বিবেচন-

ায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী-বান্ধব বাজেট প্রণয়ন তিনটি পূর্বশর্তের ওপর ভিত্তিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সনদ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, দেশীয় আইন ও নীতিমালা অনুসরণ করা;

২. সামাজিক মডেল অনুসরণ করা;

৩. বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দ্বিস্তরভিত্তিক অর্থায়ন (Twin Track Financing)।

এই তিনটি পূর্বশর্তের আলোকে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে:

১. সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা এক না হয়ে প্রতিবন্ধিতার মাত্রার ওপর ভিত্তি করে ভাতা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। যেমন- গুরুতর, মাঝারি মাত্রা, মৃদু মাত্রার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা আলাদা হওয়া উচিত।

২. অতি গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাদের জন্য সার্বক্ষণিক কেয়ারগিভারের প্রয়োজন হয়। এ বিষয় বিবেচনায় এনে কেয়ারগিভারের জন্য ভাতা কার্যক্রম চালু করা।

৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরণ ও চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন সহায়ক উপকরণ যেমন-হুইলচেয়ার (ম্যানুয়াল ও ইলেকট্রিক), ট্রাই-সাইকেল, স্কুটার, ওয়াকার, সাদাছড়ি (ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল), ক্রাচ, হিয়ারিং এইড, বহনযোগ্য র‍্যাম্প, ম্যাগনিফায়িং গাস, প্রসথেটিক, অর্থোটিক (কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অঙ্গসহায়ক উপকরণ), স্পিচ টু টেক্সট, টেক্সট টু স্পিচ, এক্সেসিবল মোবাইল অ্যাপস, ব্রেইল প্রিন্টার, কি-বোর্ড, হেড পয়েন্টার, জয়স্টিক, লার্জ প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল, স্কিন রিডিং সফটওয়ার ইত্যাদি) ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে আমদানির উপর শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করতে বাজেটে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা। এসকল পণ্য দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা করা।

৪. দেশে অনেক প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার আওতায় আনতে ও ঝরেপড়া রোধ করতে শতভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় আনা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে উপকারভোগীর সংখ্যা আসন্ন বাজেটে কমপক্ষে তিনগুণ (৩ লক্ষ) করা উচিত। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা উপবৃত্তি চালু করা।

৫. শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো প্রবেশগম্য করা (র‍্যাম্প, লিফ্ট, প্রশস্ত দরজা ইত্যাদি), তথ্যগত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযে-াগী করা যেমন- ব্রেইল বই, এক্সেসিবল ই-বুক ইত্যাদি, একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কারিকুলামে ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করতে বাজেট প্রয়োজন।

৬. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকরিতে কোটা থাকলেও তা যথাযথ বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। যা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের উদ্বুদ্ধ করতে বিভিন্ন ধাপে কর রেয়াতের সুবিধা রাখা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য মজুরিভিত্তিক এবং আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা। কর্মসংস্থানে বাধা দূর করতে কর্মক্ষেত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করতে বাজেট বরাদ্দ রাখা। প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ততা বাড়াতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলগুলো প্রবেশগম্য করে অন্তত ১০% আসন প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সংরক্ষণ করতে বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৭. ডিজিটাল বাংলাদেশের সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে সকল ওয়েবসাইট, সরকারি

ই-সার্ভিস, ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্র ইত্যাদি তাদের সম্পূর্ণ ব্যবহার উপযোগী করতে অবকাঠামোগত ও তথ্যগত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮. প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য উপযোগী পাওয়ার র‍্যাম্প বা ম্যানুয়াল র‍্যাম্পযুক্ত বাস আমদানিতে এবং তৈরির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যাহার করা।

৯. সরকারের আশ্রয়ণ কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থানচ্যুত, গৃহহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা।

১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ন, গণপূর্ত, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

১১. প্রতিবন্ধী মানুষের সঞ্চয়পত্র, এফডিআর, ডিপিএস এর ওপর সকল প্রকার ভ্যাট-ট্যাক্স ও সার চার্জ প্রত্যাহার করা।

১২. প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সংগঠন (ডিপিও) কে অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান এবং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর কর মওকুফ করা।

১৩. প্রতিবন্ধী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণে বাজেটে বরাদ্দ রাখা; নারী উদ্যোক্তাদের মতো প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদেরও আয়ের সীমা ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর ছাড় দেয়া এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি উদ্যোক্তার তৈরিকৃত পণ্য রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদান করা।

১৪. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও ক্রীড়া উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দের রাখা।

১৫. সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী ও প্রবেশগম্য করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে বরাদ্দ রাখা।

১৬. বাজেট প্রণয়নের পূর্বে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, তাদের সংগঠন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে কর্মরত সংগঠনসমূহের সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করা, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা উপযোগী বাজেট প্রণয়ণে সহায়ক হবে।

১৭. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে পরিচালনা করছে, সুতরাং এসকল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিপিও'দের জন্য বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

তারুণ্য ও কর্মসংস্থান: জনমিতিক লভ্যাংশ কাজে লাগাতে আমাদের প্রস্তুতি কতখানি?

■ উম্মে সালমা

মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৫ শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ নিয়ে জনমিতিক লভ্যাংশের এক সোনালী সময় অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই কর্মক্ষম যুবশক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা গেলে জনমিতিক লভ্যাংশের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করা যাবেনা। তরুণরাই বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনে মুখ্য অনুঘটকের কাজ করছে। টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ২০৩০ অনুযায়ী দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে হলে তরুণদের জন্য শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বেশ কয়েকটি লক্ষ্য সরাসরি সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সাথে যুব কর্মসংস্থানের বিষয়গুলোকে উল্লেখ করে।

আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করলেও বেকারত্ব বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম মুখ্য চ্যালেঞ্জ। ক্রমবর্ধমান তরুণ কর্মপ্রত্যাশীদের চাপে বাংলাদেশের শ্রমবাজার হিমশিম খাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথ্যমতে দেশের প্রায় ২ কোটি ৮০ লাখ যুবক বেকার। বিআইডিএস গবেষণামতে, দেশে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণদের ৩৩ দশমিক ৩২ শতাংশ বা এক তৃতীয়াংশ পুরোপুরি বেকার। প্রায় ৩০ শতাংশ যুবক (১ কোটি ২৩ লক্ষ) কর্মসংস্থান, শিক্ষা কিংবা প্রশিক্ষণ কোনোটির সাথেই যুক্ত নন। এদের একটি বড় অংশ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। তরুণ বেকারত্বের কারণ হিসেবে কিছু উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এরমধ্যে দেশের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা উপযুক্ত শ্রমশক্তি তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী শিক্ষাখাতে জিডিপির অন্তত ৬ শতাংশ বরাদ্দের কথা থাকলেও বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের দিকে তাকালে দেখা যায়, শিক্ষা প্রযুক্তিতে ৯৪ হাজার ৮৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, জিডিপি হিসেবে তা ২.০৮ শতাংশ মাত্র। এই বরাদ্দের মধ্যে প্রায় আট হাজার কোটি টাকা মূলত রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুতকেন্দ্রসহ অন্যান্য খাতের টাকার অংশ, যার সাথে শিক্ষা খাতের কোনো সম্পৃক্ততা নেই। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে টিকে থাকতে যেসব দক্ষতা জরুরি, প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা সেসব দক্ষতা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে অনেকাংশেই। যারা শিক্ষা গ্রহণ করছেন, শিক্ষার আশানুরূপ মানের বিচারে উচ্চতর

ডিগ্রিধারীরাও যথেষ্ট দক্ষ হয়ে উঠতে পারছেন না। সম্প্রতি ডেইলি স্টারের একটি প্রতিবেদন জানায়, ৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীই মনে করেন চাকরি বাজারের জন্য প্রস্তুত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর তেমন কোনো অবদান নেই অথবা এ ব্যাপারে তারা নিশ্চিত নন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যা পড়ানো হচ্ছে, সেসব বিষয় অনুযায়ীও পর্যাপ্ত কাজের সুযোগ তৈরি হচ্ছেনা। ফলে প্রতি বছর যে পরিমাণ তরুণ গ্রাজুয়েট হচ্ছেন সে অনুযায়ী চাকুরির বাজার বিস্তৃত হচ্ছেনা। বিশ্বব্যাংকের ২০১৯ সালের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী মহামারি পূর্ব বাংলাদেশে তিনজন গ্রাজুয়েটের মধ্যে চাকরি পেতেন মাত্র ১ জন। এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ২৮টি দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত বেকারের দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।

আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষিত তরুণদের বাইরেও নানা ধরণের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত একটি তরুণ গোষ্ঠী রয়েছে- যারা উন্নয়ন ভাবনায় হিসেবের বাইরে থেকে যাচ্ছেন। যে তরুণ পড়াশোনা থেকে ঝরে পড়েছেন- বাস কন্ডাক্টর, নির্মাণ শ্রমিক, কিংবা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন বা করবেন, সেই তরুণ পরিসংখ্যানের দিক থেকে অবহেলিত এবং তারা রাষ্ট্রীয় মনোযোগের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া। তাদের অর্থনৈতিক চাহিদা ও সক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে কাজের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনা বাজেটে উপেক্ষিত থাকছে।

দারিদ্র, সহিংসতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের অপর্যাপ্ত সুযোগ, শিক্ষার অসন্তোষজনক মান, উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সীমিত সুযোগ, প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতার অভাব, চাকুরিপ্রাপ্তিতে নারীদের নানা সমস্যা, শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ তরুণদের প্রান্তিকী-করণ, শ্রমবাজারের চাহিদা আর জোগানের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা, কাজের গুণগত মান ও শোভন কাজের অভাব, সংখ্যালঘুদের প্রতি বৈষম্য ইত্যাদি সামাজিক এবং কাঠামোগত নানা কারণে দীর্ঘ সময় ধরে তরুণদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিকে আরো জটিলতর করে তুলেছে। করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে তরুণদের বেকারত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থ-সামাজিক এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ঝুঁকির সাথে সাথে মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা, ডিজিটাল বৈষম্য, কর্মচ্যুতি ইত্যাদি নতুন সংকট তরুণদের কর্মসংস্থানকে আরো ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে চাকুরিচ্যুতি, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে যুব সমাজের একটি অংশকে ব্যাপকভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ করেছে।

বিশ্ব শ্রম সংস্থা প্রকাশিত 'বিশ্ব কর্মসংস্থান এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী- ট্রেন্ড ২০২২' প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে যে, ২০২২ সালে বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ৫ শতাংশ বেকার থাকবে, যা ২০১৯ সালে মহামারিপূর্ব বেকারত্বের হারের তুলনায় প্রায় ০.৬ শতাংশ বেশি। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির পরিসংখ্যান অনুযায়ী মানবসম্পদ উন্নয়ন সূচকে পৃথিবীর ১৮৯ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩ তম।

অন্যদিকে কোভিড ১৯ এর সাথে সাথে চতুর্থ শিল্পবিপ-ব মানুষের কাজের ধরণ, ভাবের আদান-প্রদান, তথ্যবিনিময়, উৎপাদন, ভোগ, পরিবহন, জোগানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী রূপান্তর ঘটিয়েছে। ওয়ার্ল্ড ইকনোমিক ফোরামের তথ্য অনুযায়ী অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদনে প্রযুক্তির ব্যবহার, যান্ত্রিকীকরণ, প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবন ও প্রয়োগের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ঘাটতির ফলে বিশ্বব্যাপী কর্ম হারাতে পারে প্রায় ৮০ কোটি মানুষ। দেশে-বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকদের একটি বিশাল অংশ এই ঝুঁকির মধ্যে পড়ার আশঙ্কা থাকবে।

তরুণদের এগিয়ে যাবার উৎসাহে বাংলাদেশের ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট তরুণদের জন্য আইসিটি সেক্টরে কাজের সুযোগ তৈরি, দরিদ্র এবং কম উপার্জনের শ্রমিকের জন্য খাদ্য সরবরাহ, তথ্য প্রযুক্তিতে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি, বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বল্প সুদের ঋণের ব্যবস্থা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তার ইত্যাদি রাখা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা দিতে তরুণদের জন্য গতানুগতিক দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্নিশিপের বিষয়গুলো এসেছে। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৬ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।
করোনা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কাজ হারানো তথাপি

দেশের অর্থনীতির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় তরুণদের জন্য অর্থ বরাদ্দ ঢেলে সাজানোর প্রত্যাশা থাকলেও ২০২১-২২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে তরুণদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য এবং সুপরিকল্পিত কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি।

যুবদের উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ২২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মোট বরাদ্দের মাত্র ১৪ শতাংশ সরাসরি তরুণদের কেন্দ্র করে বরাদ্দ দিয়েছে, ২৬ শতাংশ বরাদ্দ রয়েছে আংশিকভাবে। ১২টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের বরাদ্দে তরুণদের জন্য কোনো বরাদ্দ নেই।

২০২১-২২ অর্থবছরের কর্মসংস্থাণের সাথে জড়িত চারটি মন্ত্রনালয়ের বরাদ্দে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ছিল না। ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় শিল্প মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ কমেছে ১০ শতাংশ। চারটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেলেও এর মোট এবং উন্নয়ন বরাদ্দ কমেছে। এই চার মন্ত্রণালয়ের ২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সার্বিক বাস্তবায়নের হার এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাত্র ৪৪.৭ শতাংশ যা অর্ধেকেরও কম। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তুলনায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বরং সবচেয়ে দুর্বল অবস্থানে রয়েছে। এই চার মন্ত্রনালয়ে এডিপি বরাদ্দ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ১১ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন চাকুরি সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রার সাথে কোনোভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় রপ্তানিমুখী খাতের জন্য খুব সাধারণ কিছু উদ্যোগ ছাড়া বেকারত্ব সুবিধা বা বীমা প্রবর্তনের মতো কোনো উদ্যোগ নেই। বেকার ভাতা/বীমা চালু হলে এটি ছিটকে পড়া তরুণদের জন্য সহায়ক হতে পারতো। ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউনসহ গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের ফলে আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত অনেক তরুণ নতুন করে দরিদ্র অবস্থায় পতিত হয়েছেন। বাজেটে নতুন এই দরিদ্রদের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা হয়নি, একইসাথে বেকার জনগোষ্ঠীর উন্নয়নেও পর্যাপ্ত মনযোগ ছিলো না। বিভিন্ন তথ্য সমীক্ষায় দেখা করোনাকালে তরুণদের মানসিক সমস্যা বেড়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক নানা চাপ, শিক্ষায় ব্যাঘাত যার মূল কারণ। এই বহুবিস্তৃত মানসিক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঠেকাতে ছিলো না কোনো বিশেষ উদ্যোগ। ভার্চুয়াল শিক্ষাদানের ব্যাপক প্রসারের ফলে বিস্তৃততর হয়েছে ডিজিটাল বিভাজন। ভার্চুয়াল পাঠগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ডিভাইস, দফায় দফায় ইন্টারনেট/ডেটা কিনতে গিয়ে পরিবারগুলোতে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ পড়েছে। ফলে শিক্ষার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটি থেকে ঝরে পড়েছেন অসংখ্য শিক্ষার্থী। দরিদ্র ও চরম দরিদ্রদের জন্য প্রযুক্তি প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, এই বৈষম্য দূরীকরণে কি করে সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে, যুক্ত হয়নি এই গুরত্বপূর্ণ আলোচনাও। অভাব রয়েছে যুবকেন্দ্রিক প্রকল্পের, আবার যেসব প্রকল্প রয়েছে, সেখানেও এর বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে গেছে। কোনো প্রকল্পের বিলম্বিত বাস্তবায়ন মানেই বিলম্বিত কর্মসৃজন এটিও বিবেচনায় রাখতে হবে।

২০১৬-১৭ সালের পর বাংলাদেশে কোনো শ্রমশক্তি জরিপ হয়নি। কর্মসংস্থানের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ কী করে সম্ভব? কী করে অতীতে বিদ্যমান বেকারত্ব এবং মহামারি উদ্ভূত কর্মসংস্থান সংকট চিহ্নিত করে পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী বরাদ্দ সম্ভব? তরুণদের জন্য সময়োপযোগী, পর্যাপ্ত এবং উপযুক্ত কর্মসংস্থান তৈরি করতে না পারা একটি বড় ধরণের সংকট। একই সাথে শ্রমশক্তিতে সার্বিকভাবেই জ্ঞান কাঠামোর রূপান্তর প্রয়োজন, প্রয়োজন তরুণদের কর্মসংস্থান তৈরিতে একটি অধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি। তরুণদের কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাদের দক্ষ জনশক্তি করে গড়ে তুলতে প্রয়োজন সময়োপযোগী পরিকল্পনা, নীতি প্রণয়ন এবং প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

বণিক বার্তা

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

CENTRE ON BUDGET AND POLICY
UNIVERSITY OF DHAKA

The Asia Foundation